কমলকুমার মজুমদারের নির্বাচিত
দুটি উপন্যাস : গদ্যশৈলী বিশ্লেষণ

এম. ফিল. (বাংলা বিভাগ) উপাধির জন্য প্রদত্ত গবেষণা অভিসন্দর্ভ

গবেষক

অদিতি দাস

রেজিস্ট্রেশন নম্বর – ১১০৯৬৮ অফ্ ২০১০-২০১১

ক্রমিক সংখ্যা – ০০১৭০০১০৩০০৬

পরীক্ষা ক্রমিক সংখ্যা – MPBE194006

শিক্ষাবর্ষ – ২০১৭-২০১৯

তত্ত্বাবধায়ক

পায়েল বসু

বাংলা বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

কলকাতা – ৭০০০৩২

মে, ২০১৯

JADAVPUR UNIVERSITY

KOLKATA – 700 032

Department of Bengali

This is to certify that the following papers continue original research on "কমলকুমার মজুমদারের নির্বাচিত দুটি উপন্যাস : গদ্যশৈলী বিশ্লেষণ" by Aditi Das to be submitted in order to fulfill partial requirement of degree of M. Phil (Bengali). I further certify that neither this dissertation nor a part of it has been submitted in any other University for any diploma or degree.

Head

Barendu Mandal
15/5/19

Dept. of Bengali
Jadavpur University

Head
Bengali Department
Jadavpur University
Kolkata-700 032

Supervisor

সায়েন্স বসু
১৪.৫.১৯

Dept. of Bengali
Jadavpur University

Assistant Professor
Bengali Department
Jadavpur University
Kolkata-700 032

Jadavpur University

Kolkata – 700032

Department of Bengali

Certified that the thesis entitled, কমলকুমার মজুমদারের নির্বাচিত দুটি উপন্যাস : গদ্যশৈলী বিশ্লেষণ, Submitted by me towards the partial fulfillment of the degree of Master of Philosophy (Arts) in Bengali of Jadavpur University, is based upon my own original work and there is no plagiarism.This is also to certify that the work has not been submitted by me for the award of any other degree/ diploma of the same Institution where the work is carried out, or to any other Institution. A paper out of this dissertation has also been presented by me at a seminar/ conference at Department of Bengali, Jadavpur University, thereby fulfilling the criteria for submission, as per the M.Phil Regulation (2017) of Jadavpur University.

Aditi Das, 15.05.2019

ADITI DAS

Registration No – 110968 of 2010-2011

Class Roll No – 001700103006

Exam Roll No – MPBE194006

Name of the M.Phil student

with Roll number and Registration number

On the basis of academic merit and satisfying all the criteria as declared above, the dissertation work of Aditi Das entitled কমলকুমার মজুমদারের নির্বাচিত দুটি উপন্যাস : গদ্যশৈলী বিশ্লেষণ, is now ready for submission towards the partial fulfillment of the Degree of Master of Philosophy (Arts) in Bengali of Jadavpur University.

Barendu Mandal

Head Department of Bengali

15/5/19

Head
Bengali Department
Jadavpur University
Kolkata-700 032

Supervisor & Convener of RAC

Assistant Professor
Bengali Department
Jadavpur University
Kolkata-700 032

Member of RAC

15/5/19

Associate Professor
DEPARTMENT OF COMPARATIVE LITERATURE
JADAVPUR UNIVERSITY
KOLKATA-700 032

মুখবন্ধ

স্বাধীন ভাবে চিন্তা-ভাবনা করার ও তা প্রকাশের সুযোগ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে সম্ভব। আমার বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যয়ন আরম্ভ হয়েছিল ২০১০-২০১১ সালে। সেই স্নাতক প্রথমবর্ষ থেকেই বিশ্ববিদ্যালয়ে আয়োজিত বিভিন্ন সেমিনার ও পরীক্ষার প্রশ্নপত্র আমাদের চিন্তার জগতকে নানা ভাবে আলোড়িত করে। আমাদের বাংলা বিভাগের প্রশ্নপত্র এমনভাবে তৈরি করা হয় যাতে সেখানে শিক্ষার্থীদের নিজস্বতা প্রকাশের একটা জায়গা থাকে। এছাড়াও ক্লাসের সময় আমাদের স্বাধীন মত প্রকাশের জায়গা করে দেন শিক্ষক-শিক্ষিকারা। ফলে এইগুলি ভবিষ্যতের উচ্চশিক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এই ধরনের পরিবেশ সৃষ্টির জন্য আমি বাংলা বিভাগ তথা বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে কৃতজ্ঞ। পরবর্তী সময়ে স্নাতকোত্তর স্তরে বাংলা বিভাগের পাঠক্রমের কারণে আমরা গবেষণার প্রাথমিক বিষয় গুলি শিখতে পেরেছি, এইজন্য আমি বাংলা বিভাগ ও বাংলা বিভাগের পাঠক্রমসূচি-নির্ধারক কমিটির কাছেও বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ।

গবেষণার এই কাজে নানাভাবে যাঁদের সাহায্য, পরামর্শ পেয়েছি এই অংশে সেই ঋণ স্বীকারের পালা। এক্ষেত্রে আমি প্রথমেই আমার বিভাগকে ধন্যবাদ জানাতে চাই। এরপরেই এই গবেষণার বিষয় ‘কমলকুমার মজুমদারের নির্বাচিত দুটি উপন্যাস : গদ্যশৈলী বিশ্লেষণ’ নির্বাচনের ক্ষেত্রে আমাকে পরামর্শ দেন আমার মাস্টার মশাই অধ্যাপক উদয় কুমার চক্রবর্তী মহাশয়। বিষয় নির্বাচনে সহায়তা করবার জন্য আমি তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ। এরপরেই আমার তত্ত্বাবধায়ক পায়েল বসু মহাশয়া-কে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ। গবেষণা পদ্ধতির নিয়ম-কানুন বুঝিয়ে দেওয়া থেকে শুরু করে নানা বিষয়ে আমাকে সাহায্য করেছেন তিনি। এইভাবে সাহচর্য পাবার জন্য আমি মাননীয়া পায়েল বসু মহাশয়ার কাছে একান্ত কৃতজ্ঞ। টাইপ সংক্রান্ত

যাবতীয় সমস্যা সমাধানের জন্য ও সাহায্যের জন্য আমি আমার সহপাঠী অংশুমান খাঁন – কে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাতে চাই।

আমার এই গবেষণার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় গ্রন্থ ও তথ্য সংগ্রহের কাজে আমাদের বিভাগীয় গ্রন্থাগার, বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার এবং কলিকাতা লিটিল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি ও গবেষণা কেন্দ্র – এর প্রভূত সাহায্য পেয়েছি। প্রতিষ্ঠানগুলির প্রতিও রইল আমার কৃতজ্ঞতা।

স্বল্প সময়ের কারণে আমার গবেষণা নিবন্ধের মধ্যে হয়তো অনেক সীমাবদ্ধতা থেকে গেছে, তবুও আমার পক্ষে যতটা পরিশ্রম করা সম্ভব তা আমি করার চেষ্টা করেছি। ভবিষ্যতে আমার এই গবেষণা সামান্য কোনও কাজে যদি ব্যবহৃত হয়, তাহলে আমি আরও ভালো কাজ করার উৎসাহ পাব। ভবিষ্যতে ভালো গবেষণা নিবন্ধ তৈরির আশায় রইলাম।

অদিতি দাস
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

সূচিপত্র

	পৃষ্ঠা সংখ্যা
ভূমিকা	১ - ৩
প্রথম অধ্যায় – কমলকুমার মজুমদারের ব্যক্তিগত জীবন ও সাহিত্য সম্পর্কিত আলোচনা	৪ – ২৭
দ্বিতীয় অধ্যায় – কথনশৈলী	২৮ – ৪৯
তৃতীয় অধ্যায় – আন্বয়িক বিন্যাস	৫০ – ৬৭
চতুর্থ অধ্যায় – চিত্রকল্প নির্মাণ ও কাব্যময় গদ্যভাষা	৬৮ – ৮১
পঞ্চম অধ্যায় – তুলনার আলোকে বঙ্কিমচন্দ্র ও কমলকুমার	৮২ – ৯৪
গ্রন্থপঞ্জি	৯৫ - ৯৬

ভূমিকা

দীর্ঘদিন ধরেই বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ছাত্রী হিসেবে নিজের অবচেতনে বাংলা ভাষার ভাষাতাত্ত্বিক দিকটা নিয়ে আরও গভীরে জানার এক সুপ্ত কৌতূহল নিশ্চয় ছিল। তা না হলে কমলকুমার মজুমদারের উপন্যাসের গদ্যশৈলী নিয়ে জানার আগ্রহ তৈরি হত না। তবে এই আগ্রহ আরও বেড়েছে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর স্তরে 'ভাষাবিজ্ঞান' বিশেষ পত্র হিসেবে পড়ার ফলে। স্নাতকোত্তর দ্বিতীয় বর্ষে বিশ্ববিদ্যালয় আমাদের একটি গবেষণা নিবন্ধ রচনার সুযোগ করে দেয়। সেই গবেষণার অভিজ্ঞতা আমাকে এম.ফিল – এর গবেষণাতেও বিশেষ সাহায্য করেছে। আমাদের শিক্ষিকা পায়েল বসু এর সঙ্গে পরামর্শ ও গবেষণার বিভিন্ন দিক জেনে নিয়ে কমলকুমারের গদ্যশৈলী নিয়ে জানা আরম্ভ করি। প্রাথমিক বইপত্র ও তথ্যসংগ্রহের পর বিভাগ থেকে এ-বিষয়ে কাজ করার অনুমতি দেওয়া হয়। পরবর্তী সময়ে আমরা 'কমলকুমার মজুমদারের নির্বাচিত দুটি উপন্যাস : গদ্যশৈলী বিশ্লেষণ' এই বিষয়টি নিয়ে কাজ করার অনুমতি পায়।

এই কাজের ক্ষেত্রে মূলত কমলকুমার মজুমদার সংক্রান্ত বিভিন্ন বই, পত্র-পত্রিকা, গদ্যশৈলী সংক্রান্ত বই ও ভাষাবিজ্ঞানের বিভিন্ন বই এর উপর নির্ভর করতে হয়েছে।

কমলকুমার মজুমদারকে নিয়ে গবেষণা করতে যাবার মধ্যে যে একটা ধৃষ্টতা আছে তা আমি কখনই অস্বীকার করতে পারিনা। কমলকুমার হলেন ঐতিহ্যের বিশাল-বিরাট অসংখ্য ঝুরি যুক্ত বটগাছ। আমার এই ক্ষুদ্র দুইহাতের বেড় দিয়ে তাঁকে ধরবার চেষ্টার মধ্যে কোথাও যে একটা ভয় কাজ করে তা আমি স্বীকার করে নিচ্ছি। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে কমলকুমার তাঁর স্বতন্ত্র গদ্যশৈলীর জন্য বিখ্যাত। তিনি এমন একজন সাহিত্যিক যাঁর লেখার পাঠক সংখ্যা

খুবই কম ছিল। প্রথমে তাঁর পাঠকের সংখ্যা ছিল উনিশ জন, যাঁর মধ্যে একজন ছিলেন তাঁর স্ত্রী দয়াময়ী মজুমদার। কিন্তু এতে তাঁর কোনো ক্ষোভ ছিল না। সাহিত্যিকে তিনি কোনো দিন আত্মপ্রকাশের মাধ্যম হিসেবে বেছে নেননি, আসলে সাহিত্যকে তিনি ভালোবাসতেন।

কমলকুমার মজুমদার ছিলেন এমন একজন লেখক যিনি কেবল কয়েকটি ছোটোগল্পের রচয়িতায় ছিলেন না, রচনা করেছিলেন আটটি অসামান্য উপন্যাসও। শুধু লেখক বললে তাঁকে ভুল হবে। আসলে তিনি ছিলেন সম্পাদক, বাংলা লোকশিল্পের গবেষক, নাট্য নির্দেশক, ফরাসি ভাষায় পণ্ডিত, অঙ্কে আগ্রহী একজন মানুষ। এছাড়াও তিনি ছিলেন দক্ষ চিত্রকর ও কাঠখোদাই শিল্পী। যে সমস্ত পাঠক তাঁর লেখক সত্ত্বার বাইরের এই পরিচয় জানে না তারাও তাঁর লেখা পড়ে অনুমান করে নিতে পারে তাঁর শিল্পী সত্ত্বাকে। তাঁর লেখা গুলি পড়লে আমাদের অনেক সময় মনে হয় কমলকুমার যেভাবে জীবনকে দেখেছেন এবং যেভাবে আমাদের দেখাতে চেয়েছেন এই দুই ক্ষেত্রেই শিল্পীর দৃষ্টিভঙ্গি উপস্থিত থেকেছে।

কমলকুমার প্রথমে চলতি বাংলা দিয়ে তাঁর সাহিত্য রচনা আরম্ভ করেন, পরে তিনি চলে যান সাধু বাংলার গদ্য রচনার দিকে। এইভাবে তিনি নির্মাণ করেন তাঁর নিজের মতো এক ভাষারীতি যা থেকে সহজেই তাঁকে চিনে নেওয়া যায়। অন্যদিকে কমলকুমারের এই ভাষাশৈলী তাঁকে পাঠকের কাছে দুর্বোধ্য করে তুলেছে। ফলে পাঠক বার বার দুরূহতা সম্পর্কিত সংস্কারের জন্য তাঁর উপন্যাস পড়তে ভয় পায়। আসলে তাঁর উপন্যাসে আখ্যান না খুঁজে আমারা কবিতা বা ছবিতে যেমন তাৎপর্য খুঁজি তা খুঁজতে হবে তবেই তাঁর উপন্যাস আমাদের কাছে সহজ পাঠ্য হয়ে উঠবে।

আমি কমলকুমারের গদ্যশৈলী বিশ্লেষণের জন্য দুটি উপন্যাস বেছে নিয়েছি, সেইগুলি হল 'অন্তর্জলী যাত্রা' ও 'গোলাপ সুন্দরী'। 'অন্তর্জলীযাত্রা' উপন্যাসটি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে এই উপন্যাসের ভাষা পাঠকের কাছে বেশ আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছিল। পরবর্তীতে কমলকুমার তাঁর এই ভাষাকে আরও নানাভাবে নির্মাণ করেন। দয়াময়ী মজুমদার বলেছেন কমলকুমারের শ্রেষ্ঠ লেখা এই 'অন্তর্জলী যাত্রা' উপন্যাসটি। এই উপন্যাসেই কমলকুমার তাঁর সাহিত্যিক জীবনের সাংস্কৃতিক স্বাক্ষর রেখে গেছেন। প্রথম উপন্যাসেই তিনি পাঠকদের নিয়ে যান নির্জনতার দিকে। অনেকদিন ধরে বাংলা সাহিত্যের পাঠক যে গতানুগতিকতায় অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিল কমলকুমার এই 'অন্তর্জলী যাত্রা' উপন্যাসের সাহায্যে তাতে বড়ো রকমের আঘাত আনলেন। অন্যদিকে 'গোলাপ সুন্দরী' উপন্যাসটি ছোটো হলেও বেশ গুরুত্বপূর্ণ। বুদ্বুদ ও গোলাপকে প্রতীক হিসেবে ব্যবহার করে কমলকুমার এই উপন্যাসেও তাঁর ভাষার মায়াজাল বিস্তার করেছেন। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় মনে করেন 'গোলাপ সুন্দরী' কমলকুমারের সম্পূর্ণ সার্থক দু-তিনটি রচনার অন্যতম। এই উপন্যাসেও কমলকুমারের গদ্যশৈলীর নানা বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে।

আমাদের কাজের সুবিধার জন্য আমরা সম্পূর্ণ বিষয়টিকে কয়েকটি অধ্যায়ে ভাগ করে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। অধ্যায়গুলি নিম্নরূপ —

প্রথম অধ্যায় – কমলকুমার মজুমদারের ব্যক্তিগত জীবন ও সাহিত্য সম্পর্কিত আলোচনা
দ্বিতীয় অধ্যায় – কথনশৈলী
তৃতীয় অধ্যায় – আন্বয়িক বিন্যাস
চতুর্থ অধ্যায় – চিত্রকল্প নির্মাণ ও কাব্যময় গদ্যভাষা
পঞ্চম অধ্যায় – তুলনার আলোকে বঙ্কিমচন্দ্র ও কমলকুমার

তবে এই অধ্যায়গুলির মধ্যে হয় তো অজান্তে কিছু ভুল রয়েছে। সকলের সুচিন্তিত মতামত পেলে এই কাজটি কে আরও নির্ভুল করার চেষ্টা করব।

প্রথম অধ্যায়

কমলকুমার মজুমদারের ব্যক্তিগত জীবন ও সাহিত্য সম্পর্কিত আলোচনা

কমলকুমার মজুমদার ১৯১৪ সালের ১৭ই নভেম্বর (১ অগ্রহায়ণ ১৩২১ বঙ্গাব্দ) কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পৈতৃক নিবাস ছিল চব্বিশ পরগণা জেলার টাকি শহরে। এছাড়া কমলকুমারের বাবা সাঁওতাল পরগনার রিখিয়াতে একটি বাড়ি তৈরি করেছিলেন। এই বাড়িতে কমলকুমার ও তাঁর পরিবারের অন্য সকলে ১৯৪৭ থেকে বাস করতে শুরু করেন কিন্তু কলকাতায় ১২৭ রাসবিহারী এ্যভিনিউয়ে একটি ভাড়া বাড়ি তাঁদের ছিল। কমলকুমারের মাতা হলেন রেনুকাময়ী আর পিতা হলেন প্রফুল্লচন্দ্র। চার ভাই ও তিন বোনের মধ্যে কমলকুমার ছিলেন সবার বড়ো। এছাড়া অন্যান্য ভাই বোনেরা হলেন নীরদ, অমিয়, চিত্তরঞ্জন, বানী, গীতা ও শানু। কমলকুমারের ছোটবেলা কেটেছে বাবা, মা, বাবার মামা শরৎচন্দ্র রায়চৌধুরী, ঠাকুমা যোগমায়া দেবীর শিল্পময় আশ্রয়ে।

কমলকুমারের পিতা মাতা উভয়েই ছিলেন রবীন্দ্রভক্ত। বাড়িতে নিয়ম করে পালিত হত রবীন্দ্র জন্মজয়ন্তী। মাতা রেনুকাময়ী সন্তানদের খুব ছোটোবেলা থেকেই পড়ে শোনাতেন রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্রের সাহিত্য। একটু বড়ো হলে তাঁরা যেতেন মায়ের সঙ্গে যাত্রা, নাটক, চিত্রপ্রদর্শনী দেখতে। পিতা প্রফুল্লচন্দ্র ছিলেন কলকাতা পুলিশের অফিসার। নিজের কাজ নিয়েই ব্যস্ত থাকতেন। কমলকুমার ও তাঁর ভাই বোনদের সবসময়ের সঙ্গী ছিলেন তাঁদের মা। বাল্যকাল থেকেই সেইজন্যই তাঁদের যাবতীয় কল্পনা শক্তির বিকাশে তাঁদের মা রেণুকাময়ী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন।

১৯২২-১৯৩০ সাল নাগাদ কমলকুমার ও তাঁর ভাই নীরদ চব্বিশ পরগনার বিষ্টুপুর ‘শিক্ষাসংঘ’ বিদ্যালয়ে একই শ্রেণিতে ভর্তি হন। এই বিদ্যালয়ের হেডমাস্টার ছিলেন রেভারেন্ড সুধীর চট্টোপাধ্যায়। এই সময় কমলকুমার খ্রিস্টান ধর্ম ও সংস্কৃতি সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করেন। তিনি এই প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভ করেন বিদ্যালয়ের হেডমাস্টারের কাছ থেকে। রেভারেন্ড সুধীর চট্টোপাধ্যায়ের একটা বড়ো প্রভাব কমলকুমারের উপর পরেছিল। এরপর কমলকুমার ‘শিক্ষাসংঘ’ বিদ্যালয় ছেড়ে কলকাতার ক্যাথিড্রাল মিশনারি স্কুলে ভর্তি হলেও বেশি দিন সেখানে স্থায়ী হননি। শেষে কমলকুমার ভবানীপুর সংস্কৃত টোলে ভর্তি হন, সংস্কৃত শিখতে আরম্ভ করেন। সংস্কৃত শেখা শেষ হলে জীবনের প্রথাগত পড়াশোনা থেকে তিনি ছুটি নেন, দেশ ভ্রমণের নেশা তাঁকে পেয়ে বসে। নিরুপমা দেবী, শরৎচন্দ্র, সরলাদেবী এঁদের আড্ডা বসতো ব্লকমন স্ট্রিটের বাড়ির দোতলায় ফলে বাল্যকাল থেকেই কমলকুমার এঁনাদের সান্নিধ্য পান। ছোটো থেকেই কমলকুমার সেতার বাজাতে, ফরাসি ভাষা শিখতে আরম্ভ করেন। তাছাড়া ছবি আঁকতে, নাটক লিখতে, অভিনয় করতেও আরম্ভ করেন।

১৯৩৭ সাল নাগাদ ভবানীপুর থেকে সাহিত্য পত্রিকা ‘উষ্ণীষ’ প্রকাশিত হচ্ছে। এই পত্রিকায় কমলকুমারের প্রথম গল্প ‘লালজুতো’ প্রকাশিত হয়। এছাড়াও স্ত্রী ভূমিকা বর্জিত নাটকের বই ‘দুর্নাম’ প্রকাশিত হয়। ‘উষ্ণীষ’ পত্রিকার দ্বিতীয় সংখ্যায় ‘মধু’ এবং তৃতীয় ও শেষ সংখ্যায় কমলকুমারের ‘প্রিনসেস’ গল্প প্রকাশিত হয়। এইভাবেই তাঁর সাহিত্যচর্চা আরম্ভ হয়। কিন্তু ১৯৩৮ সাল নাগাদ কমলকুমার ব্যবসায় যোগ দেন। এইসময় তাঁকে চূড়ান্ত বিলাসী হয়ে যেতে দেখা যায়, মদ্যপানের অভ্যাসও এইসময় থেকেই ধরেন।

দয়াময়ী দেবীর কথায় জানতে পারি কমলকুমার যখন ছোটো ছিলেন সেই সময় প্রতি বছর দুর্গা পুজার সময় তাঁর বাবার মামার বাড়িতে বড়ো করে জমায়েত হবার একটা নিয়ম

ছিল। কমলকুমারের বাবার মামা অর্থাৎ তাঁদের দাদু সকলকে নিয়ে রিখিয়ায় যেতেন। সেখানে নাটক ইত্যাদির মহড়া হতো। এই কাজে দাদু মধ্যমণি হয়ে থাকলেও বাবা, কাকারাও উৎসাহ দিতেন। সব ভাই বোন মিলে কমলকুমাররা নাটক করতেন। তাঁর নিজের লেখা নাটকের অভিনয়ও হয় আর এই ভাবেই কমলকুমারের নাটক চর্চা আরম্ভ হয়। ১৯৩৯ সালের ১৫ জুন কমলকুমারের বাবার মামা শরৎচন্দ্র রায়চৌধুরীর মৃত্যু হলে তাঁদের পারিবারিক নাটকের রীতিটি বন্ধ হয়ে যায়। পূর্বেই উল্লেখ করেছি কমলকুমারের বাবা প্রফুল্লচন্দ্র সাঁওতাল পরগনার রিখিয়ায় একটি বাড়ি নির্মাণ করেছিলেন। ১৯৪১ সাল কলকাতার মোটেই ভালো সময় চলছিল না। জাপানি বোমার ভয়ে কলকাতার মানুষ তখন কলকাতা ছাড়ছিলেন। সপরিবারে কমলকুমাররাও এই সময় রিখিয়া চলে যান। এই রিখিয়া স্থানটি কমলকুমারের সাহিত্য জীবনে অনেকটাই প্রভাব ফেলে ছিল। তাঁর অন্যতম বিখ্যাত উপন্যাস ‘পিঞ্জরে বসিয়া শুক’ এর পটভূমি রিখিয়া।

১৯৪২-১৯৪৬ কাল পর্বে কমলকুমার কর্ম অনুসন্ধানের জন্য রিখিয়া থেকে কলকাতায় আসেন। তিনি কলকাতার দাঙ্গা, মন্বন্তর প্রত্যক্ষ ভাবে দেখেন। কমলকুমারের আড্ডার সূত্রপাত ১৯৪২ সাল থেকে, স্যাঙ্গুভেলি রেস্টুরেন্টে শিল্প-সংস্কৃতি বিষয়ে আড্ডা বসত। এইসময় তাঁকে নিজের আঁকা ছবির প্রদর্শনী বিষয়ে উদ্যোগ নিতে দেখা গেলেও কোনো অজ্ঞাত কারণে তাঁর ছবির প্রদর্শনী হয়নি।

‘আমাদের কথা’-য় দয়াময়ী মজুমদার জানিয়েছেন ১৯৪৭ সালের ৮ই মার্চ তাঁর ও কমলকুমারের বিবাহ হয়। তাঁর জবানীতে জানতে পারি বিয়ের পর প্রথম পাঁচ বছর তাঁদের কাটে আপোষহীন সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে। এই পাঁচটা বছরের মধ্যে তাঁরা মোট চোদ্দটি বাড়ি বদলান। শেষে তাঁরা স্থায়ী হন পাতিপুকুরে এস.কে.দেব রোডের একটি বাড়িতে। এই বাড়িতে

তাঁরা কাটান জীবনের নয়টা বছর। বাড়িতে থাকলে এক মিনিটও কমলকুমার বই, ছবি আঁকা, লেখালেখি ছাড়া থাকতে পারতেন না দয়াময়ী দেবী-র কথায় জানতে পারি আমরা। ছুটির দিন হোক আর কাজের বই পড়েই এই লেখকের দিন কাটত। ইতিহাস, ভূগোল, অঙ্ক সব বিষয়ই তাঁর নখদর্পণে থাকত। স্বামীর এই সর্বক্ষণ বইয়ের মধ্যে ঢুকে থাকা স্ত্রী হিসেবে তাঁর ভালো না লাগলেও তিনি বুঝেছিলেন বই ছাড়া প্রজ্ঞা, ধী আর মেধা এর সংমিশ্রণ হয় না।

১৯৫০ সাল নাগাদ সিগনেট থেকে প্রকাশিত হচ্ছে 'চলচ্চিত্র' পত্রিকা। এই পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন কমলকুমার, সত্যজিৎ, চিদানন্দ দাশগুপ্ত, রাধাপ্রসাদ গুপ্ত ও সুভাষ সেন। 'চলচ্চিত্র' পত্রিকায় কমলকুমারের 'চলচ্চিত্রে গানের ব্যবহার' প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। এইসময় 'ঘরে বাইরে' চলচ্চিত্র পরিকল্পনায় শিল্পনির্দেশনা ও ডিটেলে কাজ করেন কমলকুমার মজুমদার। 'সচিত্র ভারত' এর ২৮ পৌষ ১৩৫৭ সংখ্যায় কমলকুমারের 'আত্মহত্যা' গল্প প্রকাশিত হয়। ১৯৫১ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারি 'সচিত্র ভারত' পত্রিকার সংখ্যায় তাঁর 'প্রতিমা পয়জার'(ফিচার) প্রকাশিত হয়। ঐ বছরই 'চতুরঙ্গ' আশ্বিন সংখ্যায় 'মল্লিকা বাহার'(গল্প) প্রকাশিত হয়। এইসময় কমলকুমার ভারত সরকারের জনগণনা বিভাগে অশোক মিত্রের অধীনে কাজে যোগ দেন এবং এই কাজে তাঁর বেতন ছিল ১৫০ টাকা। এই কাজের সুবাদে তিনি পশ্চিম বাংলার একেবারে মাটির কাছাকাছি পৌঁছে যান।

১৯৫২ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় নাট্যদল 'হরবোলা'। কমলকুমারের পরিচালনায় মঞ্চস্থ হয় সুকুমার রায়ের 'লক্ষ্মণের শক্তিশেল' ও রবীন্দ্রনাথের 'মুক্তধারা'। এইসময় তিনি ডিটেকটিভ পাক্ষিক পত্রিকা 'তদন্ত' সম্পাদনা করছেন বাণিজ্যিক ভাবে। মাত্র ১৪ টি সংখ্যা বেরনোর পর এটি বন্ধ হয়ে যায়। West Bengal Rural Arts and Crafts এ কমলকুমার এই সময় কিছুদিন কাজ করেন। তারপর তিনি 'ললিতকলা অকাদেমি' এর কলকাতা শাখার কর্মী হিসেবে

যোগদান করেন। এরও পর কমলকুমার সাউথ পয়েন্ট স্কুলের আর্টস এ্যান্ড ক্রাফ্‌ট্‌ এর শিক্ষক হিসেবে চাকরিতে যোগ দেন।

১৯৫৭-১৯৫৮ এইসময় কমলকুমারের 'মতিলাল পাদরী' ও 'তাহাদের কথা' 'দেশ' পত্রিকাতে প্রকাশিত হচ্ছে। ১৯৫৯ সালে 'নহবৎ' পত্রিকার শারদীয় সংখ্যায় 'অন্তর্জলী যাত্রা' উপন্যাস প্রকাশিত হয়। এই বছর 'পরিচয়' পত্রিকার পৌষ ও মাঘ ৬৬ সংখ্যায় প্রকাশিত হয় কমলকুমারের 'কয়েদখানা'। ১৯৬০ সালে 'বক্তব্য' পত্রিকার বৈশাখ-আষাঢ় সংখ্যায় 'নিম অন্নপূর্ণা' প্রকাশিত হচ্ছে। ঐ বছর 'কৃত্তিবাস' এর শ্রাবণ সংখ্যায় তাঁর 'ফৌজ-ই-বন্দুক' গল্প বেরোচ্ছে। এছাড়াও এই বছর ১৪ চৈত্র 'আনন্দবাজার পত্রিকা'-তে পৃথ্বীশ নিয়োগীর ছবির প্রদর্শনী ব্যাপারে আলোচনা প্রকাশিত হচ্ছে। ১৯৬১-১৯৬২ এইসময় 'জনসেবক' পত্রিকার 'সাহিত্য বিচিন্তা' বিভাগে 'রোজনামা' ধারাবাহিক ফিচার রচনা শুরু করেন কমলকুমার। এছাড়া 'এক্ষণ' এর ৬২ সংখ্যায় 'কঙ্কাল এইলজি' গল্প, কথাশিল্প প্রকাশনী থেকে 'অন্তর্জলী যাত্রা' বই আকারে এবং 'এক্ষণ' ৬১ সংখ্যায় 'গোলাপ সুন্দরী' প্রকাশিত হয়।

১৯৬৩ সালে কমলকুমারের 'নিম অন্নপূর্ণা' গল্পগ্রন্থ ও 'আইকম বাইকম' প্রচলিত ছড়া এবং ছবির সংকলন কথাশিল্প থেকে, 'সুন্দরম' এর ১৩৭০ সংখ্যায় 'ঢোকরা কামরা' প্রবন্ধ যেমন প্রকাশিত হচ্ছে তেমন রবিঘোষ, শর্মিলা ঠাকুর, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের অভিনয়ে 'আলীবাবা' নাটকের প্রস্তুতি আরম্ভ হয়। ১৯৬৪ সালে 'দর্পণ' শারদীয় সংখ্যায় 'অনিলা স্মরণে', 'এক্ষণ' দ্বিতীয় বর্ষ চতুর্থ সংখ্যার 'শ্যামনৌকা' গল্প প্রকাশিত হয়। ১৯৬৫ সালে 'কৃত্তিবাস' শারদীয় সংখ্যায় 'সুহাসিনীর পমেটম' উপন্যাস ও এর সঙ্গে এই উপন্যাসেরই পাঁচটি বিশিষ্ট আলোচনা প্রকাশিত হয়। এইবছর কমলকুমারের 'পানকৌড়ি' প্রকাশিত হচ্ছে সুবর্ণরেখা থেকে, 'বাংলার মৃৎশিল্প' সমকালীন পত্রিকায় বেরোয় চার কিস্তিতে। এইবছর 'অঙ্ক ভাবনা' ত্রৈমাসিক

গণিততত্ত্বের পত্রিকা কমলকুমার প্রকাশ করলেও এই পত্রিকার দুটির বেশি সংখ্যা প্রকাশিত হয়নি। ১৯৬৬ সালে 'দর্পণ' ৬ মে সংখ্যায় প্রকাশিত হচ্ছে তাঁর 'পরিপ্রেক্ষিত' নিবন্ধ। সাহিত্য সম্বন্ধে নিজের মতামত এই প্রথম কমলকুমারকে ব্যক্ত করতে দেখা যায়। ১৯৬৭ জুন মাসে তিনি 'দেশ' পত্রিকার শিল্প সমালোচনার কাজ ছেড়ে দিচ্ছেন। এইবছর 'এক্ষণ' কার্তিক-অগ্রহায়ণ সংখ্যায় প্রকাশিত হচ্ছে 'বঙ্গীয় শিল্পধারা' এবং ১ অক্টোবর নিউ এমপায়ারে মঞ্চস্থ হচ্ছে 'লক্ষ্মণের শক্তিশেল', 'রামায়নী গাথা'।

১৯৬৮ সালে শারদীয়া 'অন্বীক্ষণ' পত্রিকায় কমলকুমারের 'কঙ্কালের টংকার' প্রকাশিত হচ্ছে, এটি ছিল মনিলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের কাহিনীর নাট্যরূপ। এই বছর 'এক্ষণ' শারদ সংখ্যায় 'রুক্মিণীকুমার' গল্প প্রকাশিত হয়। 'এমপারার জোনস' অভিনীত হচ্ছে ২ অক্টোবর মুক্তাঙ্গন মঞ্চে। এই বছরে কমলকুমারের জীবনে ঘটে যায় অন্যতম আর একটি ঘটনা, তাঁর গল্প পড়ে ই.এম.ফরস্টার অভিভূত হন ও চিঠি লিখে সে কথা তাঁকে জানান। ১৯৬৯ এ কমলকুমারের দুটি লেখা প্রকাশিত হচ্ছে একটি 'উত্তরকাল' আষাঢ় সংখ্যায় 'বাংলার টেরাকোটা' প্রবন্ধ ও অন্যটি হল 'পিঞ্জরে বসিয়া শুক' প্রকাশিত হচ্ছে শারদীয়া 'এক্ষণ'-এ। ১৯৭০- ১৯৭১ এই সময় তিনি নকশাল আন্দোলনের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে 'নকশাল ব্যাপারে আমাদের প্রেম' এই বিষয় নিয়ে অনেক গল্প লেখেন। এই সময়টা ছিল বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময়। ৭, ১৪ মে 'দর্পণ' পত্রিকা সংখ্যায় তিনি 'পূর্ববঙ্গ সংগ্রাম বিষয়ে' একটি লেখা লেখেন। 'নিষাদ' এর অক্টোবর সংখ্যায় প্রকাশিত হচ্ছে তাঁর দুটি প্রবন্ধ 'নাতুরালিজম' ও 'পদক্ষেপ' এবং শারদীয়া সংখ্যায় প্রকাশিত হচ্ছে আরও একটি প্রবন্ধ 'মার্সেল প্রুস্ত বিষয়ে কিছু'।

১৯৭০ সালের ২রা ডিসেম্বর কমলকুমার বাড়ি পরিবর্তন করেন, এবার তাঁরা চলে আসেন ৫০/ডি হাজরা রোডের তিনতলার ফ্ল্যাটে। এইসময়ে বস্তির ছেলে মেয়েদের নিয়ে

কমলকুমার একটি স্কুল খোলেন যেখানে বাচ্চাদের পড়াশোনার পাশাপাশি অভিনয় শিক্ষা চলত। কিন্তু এই স্কুল বেশি দিন স্থায়ী হয়নি। ১৯৭২ সালে 'সমতট' এর অক্টোবর সংখ্যায় প্রকাশিত হয় তাঁর আরও একটি প্রবন্ধ 'কথা এক ইশারা বটে'। 'কৃত্তিবাস' এর জানুয়ারি-মার্চ সংখ্যায় প্রকাশিত হচ্ছে 'লুপ্ত পূজাবিধি', জুন সংখ্যায় প্রকাশিত হচ্ছে 'ফাৎনা মনস্কতা' প্রবন্ধ। এই বছরই তাঁর ১১টি গল্প নিয়ে 'গল্প সংগ্রহ' প্রকাশ করে সুবর্ণরেখা। ১৯৭৩ এ কমলকুমারের একটি গল্প 'অজ্ঞাতনামার নিবাস' প্রকাশিত হয় 'আবহ' এর শারদ সংখ্যায় এবং দুটি প্রবন্ধ 'ইদানীন্তন শিক্ষা প্রসঙ্গে' 'কালি ও কলম' এর শারদ সংখ্যায় ও 'ক্যালকাটা পেন্টার্স' আলোচনা নিবন্ধ প্রকাশিত হয় 'দর্পণ' এর ৩ রা মার্চ সংখ্যায়। ১৯৭৪ এ কমলকুমার বুদ্ধদেব বসু বিষয়ে প্রবন্ধ লিখছেন 'রেখোমা দাসেরে মনে' নামে। এটি প্রকাশিত হচ্ছে 'কৃত্তিবাস' এর জানুয়ারি-জুন সংখ্যায়। এই বছর তিনটি গল্প প্রকাশিত হচ্ছে, 'এক্ষণ' শারদ সংখ্যায় 'দ্বাদশ মৃত্তিকা', 'আবর্ত' এর শারদ সংখ্যায় 'অনিত্যের দায়ভাগ', 'কালি ও কলম' শারদ সংখ্যায় 'স্বাতী নক্ষত্রের জল'।

১৯৭৫ এই বছরটা কমলকুমারের কাছে কঠিন ছিল কারণ এই সময় তিনি খুব অর্থ কষ্টে ভুগছিলেন কিন্তু তাঁর সাহিত্য চর্চা কোনো ভাবেই থেমে থাকেনি, এই বছর প্রকাশিত হতে থাকে তাঁর একের পর এক লেখা। এই বছর থেকে তিনি আরম্ভ করেন সিরিজ গল্প লেখা। এই বছরে প্রকাশিত তাঁর লেখার একটি তালিকা হল, 'জার্নাল সত্তর' এর শারদ সংখ্যায় 'বাগান লেখা', 'গাঙ্গেয় পত্র' এর চৈত্র সংখ্যায় 'খেলার দৃশ্যাবলী', 'শাব্দ' মে-জুন সংখ্যায় 'ভাবপ্রকাশ বিষয়ে' প্রবন্ধ, 'এক্ষণ' বৈশাখ সংখ্যায় 'আর চোখে জাগে' গল্প, 'আঁতু' শারদ সংখ্যায় 'শরৎবাবু ও ব্রাহ্মণ্য' প্রবন্ধের প্রথম অংশ, দ্বিতীয় অংশ প্রকাশিত হয় 'গাঙ্গেয় পত্র' এর শারদ সংখ্যায়, 'দানসা ফকির' নাটক গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হচ্ছে 'সুবর্ণরেখা' থেকে।

১৯৭৬ এ প্রকাশিত হচ্ছে ‘লেখা বিষয়ক’ প্রবন্ধ ‘জার্নাল সত্তর’ এর ৫ মে সংখ্যায়। এই বছরই ‘পরিপ্রেক্ষিত’ নিবন্ধটি শারদীয়া ‘উলুখড়’ পত্রিকাতে পুনরায় প্রকাশিত হচ্ছে। ‘আনন্দবাজার পত্রিকা’ এর ২০ নভেম্বর সংখ্যায় ‘কলকাতার গঙ্গা’ নিবন্ধ, ‘শাব্দ’ প্রতীক সংখ্যায় ‘প্রতীক জিজ্ঞাসা’ প্রবন্ধ, গ্রীষ্ম সংখ্যায় ‘বাগান দৈববাণী’ প্রকাশিত হচ্ছে। ১৯৭৭ এ ‘খেলার প্রতিভা’ উপন্যাস প্রকাশিত হচ্ছে ‘জার্নাল সত্তর’ সংখ্যার জানুয়ারি সংখ্যায়। এছাড়া এই বছরে প্রকাশিত তাঁর অন্যান্য লেখা গুলি হল ‘বাগান দৈববাণী’ এর অপর সংখ্যা ও ‘শরৎবাবু বিষয়ক নোট’ প্রকাশিত হয় ‘সত্তর দশক’ এর এপ্রিল ও জুন সংখ্যায়, ‘আর চোখে জানে’ প্রকাশিত হয় ‘এক্ষণ’ শারদ সংখ্যায়। এই বছরেই ‘ঈশ্বর কোটীর রঙ্গকৌতুক’ নামে সংকলন গ্রন্থ প্রকাশিত হয় আশা প্রকাশনী থেকে।

১৯৭৮ এই বছরও একের পর এক তাঁর লেখা বেরিয়ে যাচ্ছে, লেখালেখিতে তাঁর বিরাম নেই। নিখিল সরকারের ‘যখন ছাপাখানা এল’ গ্রন্থের সমালোচনায় কমলকুমার লেখেন ‘ছাপাখানা ও আমাদের বাস্তবতা’ প্রবন্ধ। ১৯৭৮ এর ১৯ অগাস্ট তাঁর এই প্রবন্ধটি ‘দেশ’ পত্রিকাতে বেরোচ্ছে। এছাড়াও এই বছর তাঁর যেসব গল্প বেরোচ্ছে তা হল, ‘খেলার বিচার’ ‘কৌরব’ শারদীয় সংখ্যায়, ‘খেলার আরম্ভ’ ‘এক্ষণ’ শারদীয় সংখ্যায়, ‘বাগান কেয়ারি’, ‘বারোমাস’ শারদীয় সংখ্যায়, ‘বাগান পরিধি’ ‘শিরোনাম’ শারদীয় সংখ্যায়। ‘গঙ্গানারায়ণ ব্রহ্ম’ ও ‘সাক্ষাৎ ভগবৎ দর্শন’ প্রবন্ধ প্রকাশিত হচ্ছে যথাক্রমে ‘সংস্কৃতি পরিক্রমা’ ও ‘বিভাব’ শারদীয় সংখ্যায়। এছাড়াও তাম্রলিপি থেকে ‘খেলার প্রতিভা’ পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হচ্ছে। এই সময় ‘সুবর্ণরেখা’ থেকে ‘পিঞ্জরে বসিয়া শুক’ উপন্যাস প্রকাশের প্রস্তুতি চলছিল, এই বইটির প্রুফ, প্রচ্ছদ সব কমলকুমার করলেও বইটি প্রকাশ পেতে সময় লাগে। তাঁর মৃত্যুর কয়েকমাস পর বইটি প্রকাশ পায়।

১৯৫৭- ৫৮ এই সময়ের পরে পাতিপুকুরের বাড়িতে আসার পর কমলকুমারের বইয়ের সংগ্রহ বাড়তে থাকে। এই বাড়িতে আসার পর তাঁরা ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীশ্রীমা সারদার যত বই প্রকাশিত হয়েছিল তাঁরা প্রায় সবই সংগ্রহে রেখেছিলেন। জীবনের শেষমুহূর্ত পর্যন্ত ঠাকুরের বই বিশেষ করে কথামৃত কমলকুমার খুব নিষ্ঠার সঙ্গে পড়ে গেছেন। ১৯৬১ সালের ১৯ শে ফেব্রুয়ারি কমলকুমার সি.আই.টি রোডের বাড়িতে চলে আসেন। 'চিলড্রেন অপেরা গ্রুপ' নামে একটি সংস্থা করেন তিনি। অভিনয় ব্যাপারটা কমলকুমারের খুব প্রাণের জিনিস ছিল। দয়াময়ী দেবীর স্বামীর অভিনয় দেখে মনে হয়েছে অভিনয়ের মধ্যেও তিনি ছবি আঁকার চেষ্টা করেছেন। সবরকম সামঞ্জস্য রেখেই কাজ করতে ভালবাসতেন কমলকুমার তাই তাঁর অভিনয়টিও ছন্দোময় ছবির মতোই মনে হতো।

পত্নী দয়াময়ী দেবী কমলকুমারকে একবার প্রশ্ন করেন তাঁর ব্যবহৃত পদবিন্যাস বাংলা ভাষার পিতৃতুল্য রচনাকার বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমের তো লেখায় দেখা যায়না। তখন কমলকুমার উত্তরে বলেন তাঁর ব্যবহৃত পদবিন্যাস অপ্রচলিত নয়, এই ধরণের পদবিন্যাস এককালে প্রচলিত ছিল এবং পত্নীকে একটি বই বের করে দেখান। দয়াময়ী দেবী বইটির পুরো নাম সঠিক মনে না রাখতে পারলেও প্রথমটা মনে রেখেছিলেন আর সেটা হল 'ব্রাহ্মণ্য যুগের'। দয়াময়ী দেবী লেখকের লেখার দুর্বোধ্যতা নিয়েও প্রশ্ন করেন, এর উত্তরে কমলকুমার বলেন লেখকদের পাঠক তৈরি করার দায়িত্ব থাকে ঠিকই কিন্তু পাঠকমাত্রই যে বুদ্ধিহীন হবে এমন ভাবার কোনো কারণ নেই। প্রত্যেক লেখাই কি সকলের জন্য লিখতে হবে? তাঁর লেখা না পড়ে পাঠক অন্য লেখা পড়বে, তিনি তো তাদেরকে পড়তে বলেননি। কমলকুমার সম্পর্কে আরও একটা কথা সেই সময় শোনা যেত তিনি নাকি কিছু শেখাতে চান না। দয়াময়ী দেবী এই প্রশ্নের উত্তর জানতে চান স্বামীর কাছে। উত্তরে কমলকুমার বলেন দিনের পর দিন রক্ত

জল করে তিনি যা শিখেছেন, জেনেছেন পাঠক তা এককথায় জেনে যাবে তা কেমন করে হয়। তাঁর পরিশ্রমকে বুঝতে গেলে পাঠকের চাই নিষ্ঠা, তাদের অনেক পরিশ্রম করতে হবে। কমলকুমার পাঠকদের মধ্যে চেয়েছেন ধৈর্য, চেষ্টা, ত্যাগ। তাঁর মতে ত্যাগ ছাড়া জীবনে কিছুই হয়না। অধ্যয়ন আর অধ্যবসায় অঙ্গাঙ্গী ভাবে যুক্ত ছিল তাঁর মধ্যে তাই তো তিনি ছিলেন সকলের শ্রদ্ধার ও ভালোবাসার মানুষ।

কমলকুমারের নাচ, গান সম্বন্ধেও গভীর জ্ঞান ছিল, দেশি-বিলাতি দুই এরই ছিলেন ভক্ত। তাঁর গলার আওয়াজ ছিল খুব সুন্দর। তাঁর অভিনয়তে 'Foot Step'-এর বিশেষ ভঙ্গী ছিল। আড্ডা জমিয়ে দেবার তাঁর অসাধারণ ক্ষমতা ছিল। কমলকুমারের যেমন ছিল দরাজ মন তেমনি ছিল প্রচণ্ড মেজাজ। হাজরা রোডের বাড়িতে থাকার সময় নাটকের মহড়া চলতো কিন্তু তা মাঝেমাঝে বন্ধ হয়ে যেত কমলকুমারের অসুস্থতার কারণে আবার কখনও উনি বসে থাকতেন ছেলেরা শেখাত। ১৯৭৬ সালের শেষ দিকে কমলকুমারের 'Arts and Crafts' নামে একটি স্কুল খোলার ইচ্ছে ছিল যেখানে আঁকা, আবৃত্তি সহ নানা ধরনের কাজ শেখানোর ব্যবস্থা থাকবে। কিন্তু তাঁর শরীর মোটেই ভালো যাচ্ছিলনা।

১৯৭৮ সালে নানারকম ঘাত-প্রতিঘাত তাঁকে কাহিল করে দিলেও এই সময় তিনি 'Arts and Crafts' স্কুল খোলার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েন। অক্টোবর মাসে কমলকুমার Statesman এ স্কুলের জন্য বিজ্ঞাপন দিলেন এবং সেই বিজ্ঞাপন মহাষ্টমীর দিন বেরল। স্কুলের জন্য সুরতীর্থে ঘর নেওয়া হল ও অবশেষে নভেম্বর মাসে স্কুল চালু হল। কমলকুমারের শরীর এইসময় মোটেই ভালো যাচ্ছিলনা, স্কুল মূলত চলছিল মনের জোড়েই। কিন্তু তাঁর শরীর আর বেশিদিন তাঁর সঙ্গ দিলনা। ১৯৭৯ সালের ৯ই ফেব্রুয়ারি তিনি পরলোকগমন করলেন।

কমলকুমারের ছিল অসামান্য পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা। আপাততুচ্ছ দৃশ্যের মধ্যে থেকে তিনি যে সব তথ্য আহরণ করতেন তা পরে তাঁর লেখায় প্রকাশিত হয়ে আপামর বাঙালিকে বিস্ময়ে অভিভূত করেছিল। সিনেমার ব্যাপারে কমলকুমারের কেবল উৎসাহই ছিল না তিনি এই বিষয়ে ওয়াকিবহালও ছিলেন। পুরনো দিনের দেশি-বিদেশি বহু সিনেমা তিনি কেবল দেখেননি, সেই সব সিনেমা স্মরণেও রাখেন। কমলকুমারের নিজের সিনেমা করার ইচ্ছেও ছিল। সিনেমা সম্বন্ধে তাঁর মতামত ছিল গতানুগতিকতার বাইরে। অর্থাৎ সবক্ষেত্রেই তিনি অন্যরকম কিছু করতে চাইতেন যা মানুষ আগে দেখেনি।

স্বশিক্ষিত শিল্পী কমলকুমার। তাঁর ছবির ভাষাও অন্যমাত্রা এনে দেয়। আশ্চর্য তাঁর শিল্পকর্মের নির্যাস। এই নির্যাস আমাদের ভাববোধ তৈরি করে। আমাদের প্রকৃত অর্থে আধুনিক, সমকালীন করে তোলে। উনিশ শতকীয় ঈশ্বর বিশ্বাস তাঁর ছবিকে গভীর ভাবে প্রভাবিত করেছে। পুরাণকল্পের সাধক কমলকুমারের গদ্য ও ছবির ভাষাকে পৃথক করা যায়না। এখানেই তাঁর অনন্যতা।

কমলকুমারের প্রতিভার মূলে ছিল তাঁর সুগভীর অনুসন্ধিৎসা ও বহু বিচিত্র অভিজ্ঞতা। তিনি যে রসিক ব্যাক্তি ছিলেন তা অনেকেই জানেন। তাঁর নিজস্ব পারিবারিক জীবন ছিল সীমিত। এই জীবনের ধারক ও বাহক তিনি নিজে ছিলেন। তাঁর নিজস্ব পারিবারিক জীবনের পরিণত বয়স সীমা ছিল বত্রিশ বছরের। সংগ্রামের মন নিয়ে তিনি এসেছিলেন জীবনে। এই পারিবারিক জীবনের সুবিধা–অসুবিধার মিলনে তাঁর শিল্প সাহিত্যের সাধনা। এরই ফলশ্রুতি হিসেবে যদি তা পাঠকের মনে কিছু দাগ কাটতে পারে তবে সেটাই যথেষ্ট, যথাযথ।

প্রত্যেক মানুষের মনেই থাকে নিজেকে সব দিক দিয়ে পারদর্শী করার বাসনা, এককথায় যাকে বলে পারফেক্ট। তবে কমলকুমারের ক্ষেত্রে এই আকাঙ্ক্ষা ছিল তীব্র। নিজেকে পারফেক্ট করার তীব্র আকাঙ্ক্ষা থেকে তাঁর মধ্যে জন্ম নেয় এক প্রচণ্ড মানসিক চাপ। তাঁর 'গোলাপ সুন্দরী' উপন্যাসের তিন ধরণের পাণ্ডুলিপি আছে, যেটা প্রকাশিত হয়েছিল ওটা ছিল সেটির চতুর্থ সংখ্যা। ফলে দেখা যাচ্ছে যে সময়ে তিনি যা লিখছেন সেটা নিয়েই ব্যস্ত থাকছেন, যতক্ষণ না সেটা পারফেক্ট হচ্ছে অন্য কিছুতে হাত দিচ্ছেন না। ছবি থেকে নাটক সমস্ত ক্ষেত্রেই তাঁর এই একই মনোভাব কাজ করত। তাঁর এক একটা ছবির বয়স দশের বেশি তো কম নয়। বহু নাটকের অভিনয় হয়ে যেতে পারত হয়নি একই কারণে। লেখার ক্ষেত্রে থার্ড প্রুফ পর্যন্ত কারেকশানের পর ছাপানো হয়ে গেলেও তা নানান ভাবে কারেক্ট করে যেতেন তারপর যেখানে পাঠাতে হবে সেখানে পাঠাতেন। তিনি যদি তাঁর লেখার একটু অদল-বদল করতে পারতেন তবেই বৈষয়িক জীবনে শ্রীবৃদ্ধি পেত। এইরকম প্রস্তাব যে আসতো না তা কিন্তু নয়। আসলে তিনি নিজের ভাবনার পরিবর্তন কোনো কিছুর মূল্যেই করতে চাননি। দয়াময়ী দেবীর কথায় জানতে পারি পূর্ণাঙ্গ বোধের দক্ষতার জন্য পারফেকশান জিনিসটা কমলকুমারের অস্থি মজ্জায় গেঁথে গিয়েছিল। তিনি ছিলেন শৌখিনতা বিলাসী, সাহিত্য থেকে রান্না সবকিছুই যেন রূপে, গুণে অতুলনীয় হয় এই ছিল তাঁর আকাঙ্ক্ষা। খাবারের সাথে সাথে বাসনপত্রের পরিপাট্য চাইতেন। কমলকুমারের এই পারফেকশান নিয়ে দয়াময়ী দেবী 'কমলকুমার মজুমদার: মানুষ ও শিল্পী' প্রবন্ধে আমাদের সাথে একটি সুন্দর স্মৃতি ভাগ করে নিয়েছেন –

> আমরা তখন বাইরে গিয়েছিলাম। দিনটা ছিল হাটবার। বিদেশ-বিভুঁই, সন্ধে সাতটা-সাড়েসাতটায় নিঝুম নিঝুম ভাব হয়েই আসত, রান্নাবান্না আগেই হয়ে গেছে,

> হাটের দিন। একটু দেরিতে ফিরতি-পথে একটি লোক খুব ভালো চেহারার রুপোর মতো কিছু চেলা মাছ দিয়ে গেল। মনে আছে — আমি রান্নাটা যেমন করবার তেমনই করলুম, সামান্য এতটুকু মেতি হলেই হতো, আমি আর তা গ্রাহ্য করিনি। সব সেরে আমি একবার উনি যেখানে বসেছিলেন মানে পড়ছিলেন সেখানে একটু ঘুরেফিরে বলে এলাম 'এত রাতে আর মেতির জন্যে দোকানে পাঠালুম না'। কথাটা শুনিয়ে ফের রান্নার জায়গায় ফিরে এলাম, কাজের লোকটি তখন উনুন খুঁচিয়ে চীনে আঁচের ওপর রান্না করা খাবারদাবার বসিয়ে রেখেছে। হঠাৎ ওনার পটপটে চটির আওয়াজটা এ-দিকেই এগিয়ে এল, হাতে একখানা কাগজ নিয়ে উনি হাজির, বললেন— 'তোমার মেতির দরকার, দাও, পাঁচফোড়নটা না নিয়ে আর উপায় নেই।' হ্যারিকেনের আলোয় উবু হয়ে বসে হাতের কাগজখানা মাটিতে পেতে সেই পাঁচফোড়ন থেকে বেছে বেছে এক-একটি মেতি বেরুতে লাগল, তারপর আমাকে বললেন— 'তুমি বোধ হয় ভুলে গিয়েছিলে'। ভুলে আমি মোটেও যাইনি, তবে মুখের ভাবখানা সেইরকমই করলাম। তারপর উনুন থেকে খাবারদাবার নাবিয়ে আবার উনুনে কাঠকয়লা দেওয়া হল। কয়েকটা মেতি— একটু নেড়ে নিয়ে গুঁড়িয়ে নেওয়া হল। যদিও আগেই রান্নাটা হয়ে গিয়েছিল, এইরকম ট্রিটমেন্ট করে অনুভব করলাম Perfection এবার রান্নার ভেতর ঢুকে পড়েছে।[১]

কমলকুমার মজুমদার যতদিন বেঁচে ছিলেন ততদিন তিনি ছিলেন বহু বিতর্কিত পুরুষ। নিন্দা-প্রশংসা দুই-ই তাঁর ঝুলিতে স্থান লাভ করে। তাঁর নিন্দে ছিল মূলত দুর্বোধ্যতা নিয়ে। পাঠকের দাবি ছিল তাঁর লেখা নাকি বোঝা যায়না কিছুই। আসলে পাঠকের নিজস্ব মনমাফিক মানদণ্ড থাকে সেই পচ্ছন্দের জায়গাটা যদি কোনো লেখক ধরতে না পারেন তবে বিরুদ্ধতা তৈরি হয় এটা সব লেখকেরই জানা। পাঠকদের নিয়ে কমলকুমার একদম নিরাভিমানি ছিলেন। সীমিত পাঠকের সীমায়িত শক্তির মধ্যে তিনি শেষ পর্যন্ত সন্তুষ্ট ছিলেন। নিজের ব্রততে তিনি অবিচল ছিলেন। কমলকুমার বলতেন —

> নিন্দে মানুষকে ওপরে তুলতে পারে, কিন্তু প্রশংসা বেশি ক্ষতি করে। এটা ঠিক, নিন্দেটা শুনলে হয়তো উত্তর দিতে ইচ্ছে হবে, আর প্রশংসা আবার হোক মনে হবে; আমি তাই দুটোই শুনি না।[২]

তিনি আরও বলতেন —

> কোনো মহিলা তার স্বামীর অস্বাচ্ছল্যের জন্য যদি স্বামী ত্যাগ করে স্বাচ্ছল্যের ঘরকন্না করতে পা বাড়ায় তাকে কি বলা হয়, বলো তো? আমার লেখার রীতি বদলানোকেও আমি ঠিক সেইরকমই বৃত্তি বলেই মনে করি।[৩]

শিল্প, সাহিত্য ক্ষেত্রে কমলকুমার ছিলেন ধীর, সহিষ্ণু। তিনি নিষ্ঠাবান মানসিকতার পরিপূর্ণ পরিণতি রূপে সৃষ্টি ও সাহিত্যকে দেখতেন। শিল্প, সাহিত্য ক্ষেত্রে গ্রহণ, বর্জন, অহংকার, অভিমানের কোনো জায়গা থাকেনা। কমলকুমারের বাইরের আবরণ কঠিন ছিল কিন্তু সেটা ভেদ করে ভেতরে প্রবেশ করতে পারলে নরম মনের সন্ধান পাওয়া যেত। তাঁর এই মনের সঙ্গে অনেকেই পরিচিত ছিলেন আবার অনেকের এটা অজানা ছিল। শ্রীরামকৃষ্ণের একনিষ্ঠ অনুরাগী ছিলেন তিনি। নানা সাধুমহাপুরুষের বাণী, তাঁদের জীবনকথার সম্ভার তাঁকে নানান ক্ষেত্রে উৎসাহ দিয়েছে। কমলকুমারের জীবন বহু মহাপুরুষের বাণী, চারিত্রিক দৃঢ়তা ও আদর্শের ভিত্তিতে গঠিত সেইজন্য বিখ্যাত হবার আকাঙ্ক্ষাকে তিনি স্পষ্টতই ঘৃণা করতেন। তিনি নিজের লেখায় রাজনীতির চালচিত্র থাকা একেবারেই পচ্ছন্দ করতেন না।

'আমার স্বামী কমলকুমার মজুমদার' প্রবন্ধে দয়াময়ী দেবী আমাদের জানিয়েছেন কমলকুমারের ভয়ানক ফরাসি প্রীতি ছিল। ফ্রান্সের ম্যাপটা মাথার বালিশের তলায় রাখতেন। বিয়ের আগে তিনি দামি সুট পরতেন, সঙ্গে টাই, মোজা, জুতো। কিন্তু বিয়ের পর ধুতি-পাঞ্জাবি পরতেন। দয়াময়ী দেবী সংশয় প্রকাশ করে বলেন দামি পোশাক বেশ খরচ সাপেক্ষ বলে পরতেন না মনে হয়।

কমলকুমারের একান্ত প্রিয় লেখক ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও এরপর মাইকেল মধুসূদন দত্ত। পঞ্চানন তর্কালঙ্কার থেকে সতীনাথ ভাদুড়ীর নাম যেমন তিনি করতেন তেমনি রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র এঁদের রচনার প্রতিও তাঁর সশ্রদ্ধ মানসিকতা। মাইকেল মধুসূদন দত্ত

বাংলা ভাষার যে বিবর্তন আনার চেষ্টা করেছিলেন, নব্য ভাবনায় ক্রিয়াপদকে তিনি ধরে রাখেননি, অধরাকে ধরবার মনস্কতা রেখে গেছেন তিনি, তা কমলকুমার খুবই শ্রদ্ধার চোখে দেখেছিলেন এবং এর অনুরণন তাঁকেও আন্দোলিত করেছিল। দেশি বিদেশি ডিটেকটিভ উপন্যাস পড়তে তিনি ভালোবাসতেন। এছাড়া পড়তেন অনেক ধর্মগ্রন্থ। আগেই উল্লেখ করেছি কমলকুমারের ফরাসি প্রীতি ছিল তাই বিদেশি লেখকদের মধ্যে ফরাসি কবি ও সাহিত্যিকদের লেখা পড়তে ভালোবাসতেন। মালার্মের কবিতা, মোপাসাঁ-র লেখা তিনি খুব পচ্ছন্দ করতেন তাছাড়া জেমস জয়েস, ভলত্যেয়ার, প্রুস্ত, তলস্তয়, জনসন, অলডাস হাক্সলি প্রমুখদের লেখা পড়তেন।

বিতর্কিত প্রবাদপুরুষ কমলকুমারের সাহিত্য এবং শিল্প ছিল একে অপরের পরিপূরক। তাঁর লেখায় ফুটে উঠত চিত্রের সৌন্দর্য। কমলকুমার তাঁর চিত্রে বিদেশি প্রভাব সম্পর্কে বলেন তিনি কোনো বিদেশি প্রভাবে প্রভাবান্বিত নন, তিনি সব সময় ভারতীয় রীতিকেই অনুসরণ করেছেন। যেহেতু প্রাচ্য-পাশ্চাত্য, শিল্প-সাহিত্যে তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য তাই হয়তো কখনও কখনও তার প্রভাব তাঁর দেশীয় পদ্ধতিতে ফুটে উঠতে দেখা গেছে। আমাদের দেশীয় পটুয়াদের পটচিত্র কমলকুমারের একান্ত প্রিয় ছিল। তাঁর লেখার ভাষা পাঠকের কাছে দুরূহ মনে হলেও তাঁর লেখার চিত্রধর্মীতাকে পাঠক কোনো ভাবেই এড়িয়ে যেতে পারেনি। ফলে কিছুটা হলেও তাঁর পাঠক সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। চিত্রধর্মী শুধু নয় তাঁর লেখায় একধরনের ছন্দময়তাও লক্ষ্য করা যায়। তিনি প্রাচীনপন্থী ছিলেন এই কথা মানা যায় না। আবার তাঁর লেখা সম্পর্কে শোনা যায় বিষয়বস্তু অবাস্তব তা কেবল নিরপেক্ষ সৌন্দর্য সৃষ্টি করেছে একথাও ঠিক নয়। তিনি নিজের আঙ্গিকের মৌলিকতায় বিশ্বাসী। তাঁর এই মৌলিকতা যুক্ত হয়ে যেত বিষয়ের সঙ্গে। বিষয়বস্তু কোনো ভাবেই অবাস্তব নয় বরং তা বাস্তবের সঙ্গেই সম্পৃক্ত হয়ে আছে।

কমলকুমার মজুমদার যখন লিখতে আরম্ভ করেন তখন সময় ছিল খুবই সংকটের। সেই সময়কে তিনিও অন্যান্য ঔপন্যাসিকের মতো বুঝতে চেয়েছিলেন, ধরতে চেয়েছিলেন। পাঠক ধরা লেখক তিনি হতে চাননি কোনো দিনই। তিনি চেয়েছিলেন পাঠকের বিমূর্ত রূপকে নিজের মনে ধরে রাখতে। পেশাদারিত্ব বাংলা সাহিত্যে যত জায়গা করে নিয়েছে তত পাঠক ধরার প্রবণতা বেড়েছে। গণসাহিত্য, গণসংস্কৃতি রচনার ক্ষেত্রে শিল্প বাণিজ্য নিজের জায়গা করে নিয়েছে। ভক্ত পাঠকরা তাঁর লেখায় খুঁজে পান আধুনিকতা। কমলকুমারের এই আধুনিকতা হল তাঁর সাহিত্যের আঙ্গিকের, শৈলীর ও ভাষার। তাঁর সাহিত্যে আধুনিকতা ও ঐতিহ্যের একটা টেনশন লক্ষ করেছেন কবি সুব্রত চক্রবর্তী, উৎপলকুমার বসু, চঞ্চল চট্টোপাধ্যায়, অশোক মিত্র, অনিরুদ্ধ লাহিড়ী প্রমুখরা।

কমলকুমার যখন লিখতে আরম্ভ করেন তখন বাংলা সাহিত্যে একটি মান্যভাষা তৈরি হয়ে গেছে। তিনি কবি নন, গদ্যকার হিসেবে সেই তৈরি হয়ে থাকা ভাষাকে এড়িয়ে যাচ্ছেন। একটি অন্য ভাষার নির্মাণে তিনি মনোনিবেশ করছেন। ফলে তাঁকে ঘিরে শুরু হয় আলোচনা, সমালোচনা। কোনো ভাবেই তাঁর সাহিত্যকে নাকচ করা যাচ্ছিল না। বাংলা সাহিত্যে তাঁর অবস্থান নির্দেশ করাও কঠিন হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। ফলে অনেকেই এই সময় ভাবতে আরম্ভ করেন বাংলা সাহিত্যে কমলকুমার মজুমদার একটি দ্বীপের মতো অবস্থান করছেন। মূল বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে তাঁর কোনো সংযোগ নেই। তবে কমলকুমার নামক দ্বীপকে ঘিরে যে দ্বীপপুঞ্জও গড়ে উঠেছিল। এই দ্বীপপুঞ্জের মধ্যে সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়, দেবেশ রায়, অমিয়ভূষণ মজুমদার, আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, সুবিমল মিশ্র ইত্যাদি আরও অনেকে অবস্থান করছেন। ফলে বাংলা সাহিত্যে কমলকুমার একা বিচ্ছিন্ন নন।

কমলকুমার মজুমদারের মধ্যে একটা আকর্ষণীয় ভাব মূর্তির জন্ম হয়েছিল যা তাঁকে সমবয়স্ক ও সমসাময়িক লেখকদের থেকে দূরে নিয়ে গিয়েছিল। আসলে তাঁর সাহিত্য

সম্পর্কিত চিন্তার মধ্যেই এই দূরত্বের বীজ লুকিয়ে ছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের আমল থেকেই বাংলা সাহিত্যে গোষ্ঠী গড়ার একটা মানসিকতা কাজ করে আসছিল। কমলকুমার কখনই এইরকম কোনো গোষ্ঠীর মধ্যে আবদ্ধ হতে চাননি। সাহিত্যের দলাদলি থেকে সব সময় নিজেকে দূরে রাখতে পচ্ছন্দ করতেন। আমরা দেখেছি কমলকুমারের লেখা গুলি মূলত প্রকাশিত হয়েছে অখ্যাত ছোটো পত্রিকাতে। এছাড়াও কফি হাউস, খালাসিটোলা, কমলালয়ে বইয়ের দোকান, ডি কে-র বাড়ি ইত্যাদি বিভিন্ন আড্ডায় অপেক্ষাকৃত অখ্যাত তরুন লেখক, কবিদের নিয়ে কমলকুমার নিজের একটা সাহিত্য জগৎ তৈরি করেছিলেন যেখানে তিনি ছিলেন সকলের মধ্যমণি। শুধুমাত্র সাহিত্যের খাতিরে এই বলয় তৈরি হয়েছিল তা নয়। তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য, অসাধারণ বাচনভঙ্গি, সকলকে চমকে দেবার মতো মন্তব্য, পরিমিত সূক্ষ্ম রসবোধ এই বলয় নির্মাণে অনেকটাই সাহায্য করেছিল। ফলে দেখা যাচ্ছে তাঁর জীবনচর্যা, মতামত, নাটকীয়তা, সম্মোহিত করার ক্ষমতা তাঁকে এক বিশেষ অবয়ব দান করছে যা তাঁকে সমসাময়িকদের থেকে পৃথক করছে। কমলকুমার প্রগতিপন্থী সাহিত্য সম্পর্কে শ্লেষাত্মক মন্তব্য করতেন, নিজেকে রক্ষণশীল বলে মনে করতেন, এইগুলি তাঁর তৈরি করা ছোটো বৃত্তে সমাদর পেলেও বৃহত্তর সমাজ যে তাঁর থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে এটাই স্বাভাবিক। ফলে তাঁর সামাজিক মতামতকে, অভিজাতদের প্রতি প্রেম-শ্রদ্ধাকে, এক ধরনের হিঁদুয়ানিকে সেকুলার প্রগতিপন্থীরা কোনো ভাবেই মানতে পারেননি। অথচ কলকাতায় তখন সেকুলার প্রগতিপন্থীদের আধিপত্য ফলে এইদিক থেকেই সমসাময়িকদের সঙ্গে তাঁর একটা ভেদ তৈরি হয়।

শিল্পের স্বাতন্ত্র্য, মৌলিকতাকে কমলকুমার গুরুত্ব দিচ্ছেন। প্রয়াত কবি সুব্রত চক্রবর্তীকে কমলকুমার একটি চিঠিতে লিখছেন,

> ... একমাত্র একজন সুস্থ থাকিতে পারে যদি সে খবরের কাগজে কাজ করে অথবা কোন রাজনৈতিক দলের সদস্য হয় কেননা ইহার সমক্ষে অনেক মতলব আছে,

আর উহার জন্য কলিকাতা তথা সারা পাঠক মহল মুখাইয়া আছে; ইহাকে সামাল দিতে প্রাণ অন্ত;... ।[৪]

ফলে এই কথাগুলি পড়ে আমরা বুঝতে পারছি বাংলা সাহিত্যে তখন দুটি ধারা ছিল, যার মধ্যে একটি ধারা সংবাদপত্রের ব্যবসায়িক প্রয়োজন মেটাচ্ছে আর অন্য ধারার আশ্রয় রাজনৈতিক দল। সাহিত্য সমাজের চিত্র যখন এমন তখন কমলকুমারকে নিজের সংকল্পে দৃঢ় থাকতে গিয়েও অনেক সমস্যায় পরতে হয়েছে যার মধ্যে সবচেয়ে বড়ো সমস্যা ছিল অর্থের সমস্যা। কারণ তিনি কোনো ভাবেই লেখাকে তাঁর পেশা হিসেবে নিতে পারেননি কোনো দিনই। সাহিত্য চর্চায় নিবিষ্ট থাকাটা ছিল কমলকুমারের জীবনের সবচেয়ে বড়ো রক্তাক্ত সংগ্রাম। অনুরাগী পাঠকের ভালোবাসা পেলেও বাংলা সাহিত্যে তিনি দলছুট হয়ে পরলেন। ফলে প্রথাবদ্ধ সাহিত্যিক মহলের নানা রকম রটনায় কমলকুমারের লেখা পড়ার আগেই পাঠক জেনে যেতে থাকল 'কমলকুমার দুর্বোধ্য'। আমরা দেখতে পাচ্ছি কমলকুমার একদিকে যেমন দলছুট হয়ে পড়ছেন তেমনি অন্যদিকে তাঁর লেখা পাঠের সম্ভাবনাও কমে যাচ্ছে। তাঁকে তাঁর সংকল্পে দৃঢ় থাকতে অনেক বেশি সংগ্রাম করতে হয়েছে।

আধুনিক সময়, ছাপার যন্ত্র, সাহিত্যের পণ্যায়ন এই গুলি সাহিত্য রচনা ব্যাপারটিকে ব্যবহার্য জিনিস অথবা অন্য কিছু করতে চাইছিল। কিন্তু কমলকুমার এই ভাবে আধুনিক হতে চাননি। ভারতচন্দ্র যে আধুনিকতার শৈশবের প্রদীপ জ্বেলেছেন কমলকুমার সেই প্রদীপের আলোয় আধুনিক হতে চেয়েছেন। তাঁর লেখার ক্ষেত্রে দুটি জিনিস আমাদের দেখতে হবে এক শিরোনামের পর কমলকুমার মজুমদারের নাম আর অন্যটি হল গুরুবন্দনা। এইদুটি দেখে আমাদের বুঝে নিতে হবে আমরা যা পড়তে চলেছি তাকে কোনো ভাবেই আর পাঁচটা লেখার সঙ্গে গুলিয়ে ফেললে চলবে না। আমাদের বুঝে নিতে হবে যে লেখা আমরা পড়তে চলেছি তা

ঠাকুরের পুজার মতো পবিত্র। এই লেখা যিনি লিখছেন তিনি রক্তাক্ত জীবন সংগ্রাম করে লিখছেন।

কমলকুমার যখন লিখছেন তখন প্রগতিশীল যে সমস্ত লেখক, সমালোচক, তাত্ত্বিকরা লিখছিলেন তাঁরা মূলত শ্রেণি সংগ্রামের ইতিহাস নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন। এই সমস্ত লেখকরা রাশিয়ার, চিনের কৃষকদের সঙ্গে বাংলার কৃষকদের বিশেষ পার্থক্য করতেন না। ফলে তাঁরা এদের শোষিত হিসেবে আঁকতেই পছন্দ করতেন। কিন্তু কমলকুমার সম্পূর্ণ মানুষকে খুঁজতে চাইলেন। একজন কৃষকের স্মৃতি, সংস্কার, রসবোধ, কল্পনা, দাম্পত্যের মধ্যে থেকে প্রকৃত মানুষটাকে খুঁজে বের করতে চেষ্টা করলেন।

কমলকুমার মনে করতেন ইতিহাস চাইছি আমরা এটা ঠিক নয়, এখানেই আমাদের সর্বনাশ হচ্ছে। এই ইতিহাস চাওয়ার পিছনে আমাদের মধ্যে কাজ করতে থাকে জাতি গঠন, জাতীয় চরিত্র গঠন। কিন্তু এই ধরনের মান্যায়ন আমাদের ক্ষেত্রে খাটে না বা আমাদের ক্ষেত্রে প্রয়োজনও নয়। আসলে এই জাতি গঠনের প্রশ্নের সমাধান করতে গিয়ে আমরা রাতারাতি পশ্চিমী অর্থে আধুনিক হতে চাইছি আর এর ফলেই সমস্যা তৈরি হচ্ছে। এই আধুনিক হতে গিয়ে আমরা আমাদের সভ্যতা, সংস্কৃতি থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছি। সেই জন্য কমলকুমার মনে করেন এর ফলে আমরা আমাদের অতীতকে হারিয়ে ফেলছি।

পাঠককে কোনো ভাবে যুক্তির ফাঁদে ফেলা কমলকুমারের লক্ষ্য নয়। দেশীয়, গ্রামীণ, অন-অভিজাত, বিদ্যার অহঙ্কার বর্জিত তাঁর লেখা। এইধরনের লেখায় বাজতে থাকে সহজ গভীর সুর। এই ধরনের লেখা আমাদের মনকে উসকে দেয়, আমাদের দেখা, ভাবনাকে অন্যদিকে চালনা করে। আলাপচারিতা এই ধরনের লেখার অন্যতম বৈশিষ্ট্য যা লেখাটিকে বদ্ধ না রেখে উন্মুক্ত করে দেয়। কমলকুমারের সমস্ত ভাবনা চিন্তা আমাদের বাঙালি অস্তিত্বকে ঘিরে। কিন্তু তিনি অন্য কোনও নবজাগরণ আনতে চাননি। তিনি আসলে বাঙালির আধুনিকতার

সঙ্গে ঐতিহ্যের নিবিড় বন্ধনটি দেখিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। বাঙালির তার চিন্তা, শিল্পকর্ম, জীবনচর্যায় মনুষ্যত্বের পূর্ণতা সম্পর্কে যে ভাবনা তাকেই কমলকুমার নিজের মন দিয়ে, নিজের যুক্তি বুদ্ধি দিয়ে বুঝে নিতে চেয়েছেন।

কমলকুমার আখ্যান রচনায় দেশজ রীতিকে গ্রহণ করলেন। প্রাচীন বাংলা কাব্যই তো সেই আখ্যানের ধাত্রী। তাঁর অন্যতম বিখ্যাত উপন্যাস 'অন্তর্জলী যাত্রা' গদ্য হয়েও কাব্যধর্মকে যত দূর সম্ভব আত্মসাৎ করতে সক্ষম হয়েছে। যে ইউরোপীয় রীতিতে এতকাল উপন্যাস লেখা হচ্ছিল কমলকুমার সেই রীতি গ্রহণ করলেন না। ফলে তাঁর 'অন্তর্জলী যাত্রা' স্বাধীনতার পর বাংলা ভাষায় রচিত অন্যতম এক প্রধান স্তম্ভ হয়ে গেল সাহিত্য রূপ ও ভাষার প্রশ্নে।

কমলকুমার চেয়েছিলেন খাঁটি বাংলা ভাষায় খাঁটি বাংলা সাহিত্য রচনা করতে যেখানে পাশ্চাত্য প্রভাব আসতে পারে আলো-ছায়ার মতো তার বেশি কিছু নয়। ধার করা আধুনিকতার বিপরীতে কমলকুমারের অবস্থান। নবনীতা দেবসেন কমলকুমারের মধ্যে ভারতীয় ঐতিহ্যের প্রতি মরণটান অনুভব করেন। অন্যদিকে সন্দীপন চট্টোপাধ্যায় কমলকুমারকে আধুনিকতার প্রায় শেষ বলে মনে করেছেন। তাঁর মতে কমলকুমার যে পড়েনি কলকাতা তাকে শিক্ষিত মনে করে না। তিনি আরও বলেছেন যে 'গোলাপ সুন্দরী' প্রকাশের পর বোঝা গেল তাঁর উদ্দেশ্য হল অমরতা সৃষ্টি করা আর এখানেই কমলকুমার ট্রাজিক। তিনি মনে করতেন আধুনিক সাহিত্যের গতির বিপরীতে কমলকুমার অবস্থান করছেন। যে ভাষা চলে আসছে সেই ভাষায় একটু অদল বদল না করলে নতুন চিন্তা, নতুন ভাবনা প্রকাশ করা সম্ভব নয়। আসলে জগৎ তো সেই এক, কিন্তু প্রকাশ করার কায়দার মধ্যে বৈচিত্র্য আনতে হবে।

কমলকুমারের সাহিত্য রচনার পর থেকেই আরম্ভ হয়েছে বিতর্ক। লেখক মহল থেকে পাঠক মহল সব ক্ষেত্রেই কমলকুমার সমালোচিত হচ্ছেন। শুধু সমকাল নয় এই সমালোচনা চিরকালীন। বাংলা সাহিত্যে এইধরনের সমালোচনা একমাত্র ভারতচন্দ্র ও মধুসূদনকে কেন্দ্র

করেই হয়েছে। তাঁর লেখা কি সংযোগের এই রকমের প্রশ্ন উঠতে থাকে বারবার। এর দায় কখনও পড়েছে পাঠকের উপর তো কখনও পড়েছে লেখকের উপর আবার কখনও পড়েছে কমলকুমারের ভাষার উপর। বিদগ্ধ পাঠকেরা মনে করে যে তারা অনেক জটিল জটিল সাহিত্য যেমন পড়তে পেরেছে তেমনি সেইসব সাহিত্যের রসও গ্রহণ করতে পেরেছে। কিন্তু কমলকুমার তাঁর লেখার চারিধারে কঠিন দেওয়াল রচনা করে রেখেছেন যার ফলে তারা এই সাহিত্যের রস আস্বাদন করতে পারেনা। কমলকুমারের সাহিত্য পাঠ একসময় ইন্টেলেকচুয়াল ফ্যাশন হয়ে উঠেছিল, এই রেশ এখনও নেই তা আমরা বলতে পারিনা। আসলে কমলকুমারের সাহিত্য পাঠের তিন ধরনের পাঠক পাওয়া যায়। প্রথম ধরন যারা দুর্বোধ্য বলে পড়তে পারেনা। দ্বিতীয় ধরন ভালো করে পড়েনা, আসলে এরা পড়তে পারেনা বলে উল্টোপাল্টা গল্প করে। তৃতীয় ধরন সুব্রত চক্রবর্তী, চঞ্চল চট্টোপাধ্যায়, অতীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতো পাঠক। ফলে আমরা বুঝতে পারছি কমলকুমারের সঙ্গে তার পাঠকের সম্পর্ক বোঝা একটা জটিল ব্যাপার। তাঁর লেখা নিয়ে যে সংযোগের প্রশ্ন বার বার উঠেছে যা একটু আগে বললাম তাতে আমরা দেখতে পাচ্ছি কমলকুমার ও তাঁর পাঠকের মধ্যে একটা দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক গড়ে উঠলেও এই দুই এর মাঝে যা আছে তা হল একটা ‘পাঠ’। কমলকুমার যে ধরনের লেখা লিখছেন তাতে সেই লেখা একদিকে যেমন পাঠক খুঁজে নিচ্ছে তেমনি পাঠক আবিষ্কার করছে লেখাটিকে। এর ফলে পাঠক ও রচয়িতার মধ্যে যে সম্পর্ক তৈরি হচ্ছে যা বাংলা আধুনিক গদ্য সাহিত্যে এর আগে দেখা যায়নি। এই দিক দিয়েও কমলকুমার তাঁর সমসাময়িক রচনাকারদের থেকে পৃথক হয়ে যাচ্ছেন।

চল্লিশের দশকে গণসাহিত্যের জয়-জয়কার চলছিল। কমলকুমারের কাছে এই জয়-জয়কার অসহ্য বলে মনে হয়েছিল। সাহিত্য রচনার ক্ষেত্রে ঐতিহ্যকে বাদ দিয়ে গণমুখী সাহিত্য রচনার কমিউনিস্ট কর্মসূচিকে কমলকুমার গ্রহণ করতে চাননি। এর বিপরীতে গিয়ে

তিনি নিম্নবর্গের সংস্কৃতি লালিত শিল্পের উৎকর্ষকে গ্রহণ করেন। তিনি গদ্যকে তথ্য বহনকারী মুটে হিসেবে কোনো দিন কল্পনা করতে পারেননি। বাজারে যা চলে বাঙালির কাছে তাই ভালো সাহিত্য। এইধরনের সাহিত্যে আধুনিকতা অনেকটা চুমকির মতো। কিন্তু আমাদের সাহিত্যের অন্তরালে যে আধুনিকতার জন্ম তার সবটা ধার করা নয়, এর বীজ ভারতচন্দ্রে আছে। কমলকুমার এমন একজন লেখক যিনি আপন সংস্কৃতিতে পুষ্ট, আবার পশ্চিমের সাহিত্য ঐতিহ্য সম্পর্কেও সজাগ।

সাহিত্যে রস সৃষ্টি করবার জন্যই কমলকুমার ভাষাকে আক্রমন করেছেন। এই ভাষার প্রশ্নেই তিনি তথাকথিত আধুনিকদের থেকে আলাদা হয়ে যাচ্ছেন। মাইকেল মধুসূদন দত্ত, অক্ষয়কুমার দত্ত, সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়, কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য প্রমুখের ভাষাকে শ্রদ্ধা করতেন কমলকুমার। রবীন্দ্রযুগ থেকে আরম্ভ করে আধুনিক লেখকরা এমনকি কমলকুমারের সমসাময়িক লেখকরাও একদম সহজ সরল সাদামাটা ভাষাকে সাহিত্যের ভাষা করতে চেয়েছিলেন। অনেকে একেবারে মানুষের মুখের ভাষাকে, কথ্য ভাষাকে সাহিত্যের ভাষা করতে চাইছিলেন। ফলে কমলকুমার যখন সাহিত্য রচনা করতে আসেন তখন তাঁর সামনে যে ভাষা ছিল তাতে তাঁর মনে হয় যে তিনি যেমন ধরনের সাহিত্য রচনা করতে চাইছেন তা এই ভাষায় করা অসম্ভব। তিনি ভাষাকে আক্রমণ করে তাকে নবরূপে গড়ে তুলতে চান। বাংলা গদ্যের একমাত্র বিতর্কিত রূপ ছিল রবীন্দ্রনাথের হাতে গড়া গদ্য। এই গদ্য কমলকুমার গ্রহণ করতে পারেননি।

কমলকুমার ভাষাকে নিজের মতো করে গড়ে নিচ্ছেন। এর আগে বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথও ভাষাকে নিজেদের মতো করে গড়ে নিয়েছিলেন। শিল্পী কমলকুমার মজুমদারও এর বিকল্প নন। রবীন্দ্রনাথের পর বাংলা গদ্যকে নিয়ে এতখানি পরিশ্রম, এতখানি ভাবনা চিন্তা কমলকুমার ছাড়া আর কেউ করেছেন বলে আমাদের জানা নেই। মান্য ভাষাকে তিনি

সাহিত্যের ভাষার ক্ষেত্রে শেষ কথা বলে ভাবতেন না, অন্যদিকে সাহিত্যের বাহন হিসেবে ভাষাকে ভাবতেন না। কমলকুমারের কাছে ভাষায় সাহিত্য, ভাষায় শিল্প। এঁটো, ধারকরা আধুনিকতার চাইতে ভারতচন্দ্র, রঙ্গলালে তিনি আধুনিকতা খুঁজতে থাকেন। চল্লিশের দশকের কমলকুমারের বেড়ে ওঠা সংকর সংস্কৃতির পরিমণ্ডলে। ফলে খাঁটি বাংলা ভাষার গদ্য নির্মাণ তাঁর কাছে মোটেই সহজ ব্যাপার ছিল না। যখন সবাই বিচ্ছন্নতা বোধে আক্রান্ত তখন কমলকুমারের জন্ম এক গভীর প্রদেশে। কৌমের অভিজ্ঞতার শিল্পরূপ, গুহাচিত্রের দেখা পাওয়া যাচ্ছে তাঁর লেখায়। ব্যাক্তি কমলকুমার, লেখক কমলকুমার এক হয়ে যাচ্ছেন ফলে জন্ম নিচ্ছে এক অসাধারণ শিল্প সাহিত্য। তিনি যখন লিখছেন তখন দাঙ্গা, দেশভাগ, সন্দেহ, হতাশা, ক্ষয়ের সময়। এর মাঝেও তিনি লিখে যাচ্ছেন ঈশ্বরকে সাধনা করার মতো করে। কমলকুমার বাংলা ভাষার এমন একজন শিল্পী যার মধ্যে শিল্পী ও সন্ত এক হয়ে গেছে।

অতীত কমলকুমারের কাছে মায়ার মতো, এই অতীত তাঁর কাছে বর্তমানও। দৈনন্দিন ঘটনা নিয়ে সাহিত্য রচনা করলেও সেই রচনায় পড়ে প্রাচীনতার ছাপ। কৌম জীবনের নির্যাস হিসেবে পুরাণ, ব্রতকথা, খণ্ড ইতিহাস, ধ্রুপদী সংগীত, বাংলার মন্দির ভাস্কর্য, ধর্ম সংস্কার কমলকুমার আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। ডোম, বাগদি, চাষা তাঁর রচনার কেন্দ্রীয় চরিত্রই শুধু হয়ে ওঠেনি দরিদ্র, শোষণের বাইরে যে তাদেরও একটা মন আছে, চৈতন্য আছে তা কমলকুমার আমাদের দেখিয়েছেন। তাঁর এইসব গুণ সমসাময়িকদের থেকে তাঁকে পৃথক করেছে।

গিরিশ ভক্ত কমলকুমার সাহিত্যকে কাব্য ও সাহিত্যিককে কবি ভাবতেন দেশীয় ঐতিহ্যে। গিরিশচন্দ্রের কথায় আমরা জানতে পারি তাঁর বয়স যখন পঞ্চদশ তখন তাঁদের পাড়ার ভগবতী গাঙ্গুলীদের বাড়িতে হাফ্-আখড়াই এর আয়োজন, সেখানে একজন ভদ্রলোক কাপড়-চোপড় পড়ে আসেন আখড়ায় গান বাঁধতে, গিরিশচন্দ্র শোনেন তাঁর নাম ঈশ্বর গুপ্ত।

সমস্ত লোক ঈশ্বর গুপ্তকে একসঙ্গে অভ্যর্থনা করেন। কমলকুমারের আমলে এই স্বতঃস্ফূর্ত সমাদর সম্ভব ছিলনা। কারণ তখন পাঠক ও রচয়িতার মধ্যে একটা দুরত্ব তৈরি হয়ে গেছে। স্বাধীনতা উত্তর বাংলা সাহিত্যের ধরনটাই বদলে যায়। ঈশ্বর গুপ্ত যে সম্মান পাচ্ছেন তার মূলে রয়েছে পাঠকের, শ্রোতার মনকে নাড়িয়ে দেবার ক্ষমতা, ভাবের মিল। কমলকুমার যখন লিখতে আসেন তখন সাহিত্যের এই ভাবটায় অনুপস্থিত হয়ে যায়।

অতীতে আমরা যা কিছু ফেলে এসেছি না ভেবে বা ভুল করে কমলকুমার আবার তাকেই মর্যাদা দিতে চাইছেন। বিংশ শতাব্দীতে এসেও তিনি কবি, কাব্যরসিকদেরকে একই গণ্ডির মধ্যে দেখতে চাইছেন। ফলে এই দিক দিয়ে তিনি অ-প্রতিষ্ঠানিক লেখক হয়ে পড়ছেন। কিন্তু তা হলেও গড়পড়তা প্রতিষ্ঠান বিরোধী লেখকদের মধ্যে তাঁকে ধরা যাবেনা কারণ তিনি শারদীয়া সংখ্যার লেখক নন। সাধারণ পাঠকের বিনোদনের জন্য কমলকুমার কোনো দিন নিজের সময় নষ্ট করেননি। নিজেকে শিক্ষিত করবার ব্যাপারেও তিনি অ-প্রতিষ্ঠানিক। নিজের পাঠক্রম তিনি নিজে তৈরি করতেন। তিনি টোলে কিছুদিন সংস্কৃত শেখেন আগেই উল্লেখ করেছি। ফলে দেখা যাচ্ছে প্রাতিষ্ঠানিক কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় এর বাইরে গিয়ে তিনি নিজেকে গড়ে তুলেছেন এইদিক দিয়েও প্রতিষ্ঠানের প্রভাব তাঁর মধ্যে অল্প।

তথ্যসূত্র:

১। দয়াময়ী মজুমদার, ২০১২, আমার স্বামী কমলকুমার, নদীয়া, আদম, পৃ. ৪৯।

২। তদেব, পৃ. ৫০।

৩। তদেব, পৃ. ৫১।

৪। রাঘব বন্দ্যোপাধ্যায়, ডিসেম্বর, ২০১৫, কমলকুমার,কলকাতার পিছুটান, কলকাতা, আনন্দ, পৃ. ১৩।

দ্বিতীয় অধ্যায়

কথনশৈলী

পঞ্চাশের দশকের বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের কথাসাহিত্যিকদের মধ্যে অন্যতম হলেন কমলকুমার মজুমদার। তিনি সাহিত্য রচনায় নিজস্ব শৈলী নির্মাণে প্রয়াসী হন। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের পাঠকদের সামনে তিনি নিজের লেখা প্রকাশ করেন, পাঠক ধাক্কা অনুভব করে কারণ এই ধরনের লেখার সাথে তারা এর আগে পরিচিত ছিল না। আমাদের এই অধ্যায়ের অনুসন্ধানের বিষয় হয়ে উঠেছে কমলকুমার মজুমদারের উপন্যাসের 'কথনশৈলী'। আমরা আমাদের নির্বাচিত 'অন্তর্জলী যাত্রা' ও 'গোলাপ সুন্দরী' উপন্যাসের সহায়তায় কমলকুমারের উপন্যাসের 'কথনশৈলী' এর ধরনটি বুঝে নেবার চেষ্টা করব।

'কথন' আখ্যানের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কথক মূলত কথনের মাধ্যমেই আখ্যানকে এগিয়ে নিয়ে যান। এই কথকের উপরেই আসলে কথনের ধরন নির্ভর করে। যিনি আখ্যানের কথক তাঁর অবস্থানের উপর পুরো বিষয়টা নির্ভর করছে। কোনো আখ্যানের কথনশৈলী যদি আমাদের বুঝতে হয় তবে আমাদের দেখে নিতে হবে আখ্যানের যিনি কথক তাঁর অবস্থানটা ঠিক কোথায় অর্থাৎ তিনি কি কাহিনি তলের কোনো চরিত্র হয়ে কাহিনি তলের মধ্যে অবস্থান করছেন আর নাকি কাহিনি তলের বাইরে থেকে পাঠককে কাহিনির সূত্র ধরিয়ে দিচ্ছেন। অমিতাভ দাস এর 'আখ্যানতত্ত্ব' বইতে আমরা পায় এই 'কথন' এর যিনি নিয়ন্তা সেই কথকের অবস্থানের ভিত্তিতে আখ্যানে ঠিক কেমন কথন পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে আখ্যানতাত্ত্বিক Stanzel সেগুলিকেই চিহ্নিত করেছেন এইভাবে –

সর্বজ্ঞকথন পরিস্থিতি (authorial narrative situation)

আত্মকথন পরিস্থিতি (first-person narrative situation)

ভূমিকানুগ কথন পরিস্থিতি(figural narrative situation)

আত্মকথন – এই ধরনের কথনের ক্ষেত্রে নিরীক্ষক একই সঙ্গে কথক ও কাহিনিতলে অবস্থান করেন ফলে অন্তঃপ্রেক্ষিত তৈরি হয়। এক্ষেত্রে 'পুরুষ' (person) গুরুত্ব পাচ্ছে।

সর্বজ্ঞকথন – এ ক্ষেত্রে নিরীক্ষকই কথক কিন্তু তাঁর অবস্থান কাহিনিতলের বাইরে ফলে বহিঃপ্রেক্ষিতের সৃষ্টি হয়।এক্ষেত্রে 'প্রেক্ষিত' (perspective) গুরুত্ব পাচ্ছে।

ভূমিকানুগ কথন – এই ধরনের কথন একটু অন্যরকম। এ ক্ষেত্রে নিরীক্ষক কখনও কথক, কখনও কাহিনিতলের কোনো চরিত্র বা ভূমিকা। কাহিনিতলের মধ্যে কথক অবস্থান করেননা । কাহিনিতলের বাইরে কথকের অবস্থানের ফলে একদিকে যেমন বহিঃপ্রেক্ষিত তৈরি হয় তেমনি অন্যদিকে কাহিনিতলের মধ্যে অবস্থিত ভূমিকাদের ফলে অন্তঃপ্রেক্ষিত তৈরি হয় আর এই দুই প্রেক্ষিত মিলে তৈরি হয় ভূমিকানুগ কথন। এই ধরনের কথনে অন্তঃপ্রেক্ষিত ও বহিঃপ্রেক্ষিতের অনবরত বিনিময় এর ফলে আখ্যানে ভিন্ন মাত্রা যোগ করে। এক্ষেত্রে 'কথন প্রকৃতি' (mode) গুরুত্ব পাচ্ছে।

অমিতাভ দাস তাঁর 'আখ্যানতত্ত্ব' বইতে আরও বলেছেন, আখ্যান মাত্রই কথনতলে থাকে তিনটি উপাদান, যথা-কথক, শ্রোতা- পাঠক, কথাবস্তু

কথক - উত্তম পুরুষ বা বক্তা পুরুষ

শ্রোতা-পাঠক – মধ্যম পুরুষ বা শ্রোতা পুরুষ

কথাবস্তু – প্রথম পুরুষ বা ভিন্ন পুরুষ

মূলত কাহিনির একই তলে যদি কথকের অবস্থান হয় তবে হয় উত্তম পুরুষ আর না হলে হয় প্রথম পুরুষ।

ফোকালাইজেশন – অমিতাভ দাসের 'আখ্যানতত্ত্ব' বইতে আমরা পেয়েছি আখ্যানের ক্ষেত্রে 'নিরীক্ষণ' (focalization) যাঁর দৃষ্টিতে হয় তাঁর উপরই নির্ভর করে আখ্যানের কথন কেমন ধরনের হবে। আসলে 'নিরীক্ষণ', এর মাধ্যমে স্থির করা হয় কাহিনিটি কাঁর বা কাঁদের চোখ দিয়ে পাঠককে দেখান হবে ও পাঠক দেখবে। আমরা দেখেছি কথক যেই হোক, কাহিনি বিশ্ব সবসময় তাঁর চোখ দিয়ে উপস্থাপিত নাও হতে পারে। 'নিরীক্ষণ' হল আখ্যানের সেই কৌশল যা আখ্যানের উপাদান গুলিকে চালিত করে। কাঁর বা কাঁদের 'নিরীক্ষণ' দিয়ে আখ্যান বিশ্ব উপস্থাপিত হবে তার উপরই মূলত নির্ভর করে আখ্যানে কোনটি গুরুত্বপূর্ণ হবে ভূমিকাগুলির অন্তঃপ্রেক্ষিত না বহিঃপ্রেক্ষিত। আর এরই মধ্যে দিয়ে নির্ধারিত হয়ে যায় আখ্যান কথন কেমন হবে সর্বজ্ঞকথন রীতির নাকি আত্মকথন রীতির অথবা এই দুই এর দান্দ্বিকতায় ভূমিকানুগ কথন রীতির।

আমাদের আলোচ্য কমলকুমার মজুমদারের দুটি উপন্যাস যথাক্রমে 'অন্তর্জলী যাত্রা' ও 'গোলাপ সুন্দরী' এর আখ্যান বিশ্বের নিরীক্ষণ এর ধরনটি আমাদের গবেষণার বিষয় হয়ে উঠেছে, নিম্নে উপন্যাস গুলি থেকে কিছু উদাহরণের মধ্যে দিয়ে এই বিষয়টি বুঝে নেবার চেষ্টা করা হল —

- বৈজু কারণসলিলে একটি ক্ষুদ্র পল্লবিত শাখাবৎ, দূরে কোথাও দ্বীপ প্রচ্ছন্ন হইয়া আছে, সুতরাং তার প্রতি সকলের আকর্ষণ অহেতুক নহে। তথাপি বৈজুর কথায় জনগণ অতিষ্ঠ হইয়া উঠিতেছিল, শুধু কথা কেন, তাহার তুচ্ছ হেরফের গভীর হইয়া দেখা দেয়, যেহেতু তাহার দেহকে অবলম্বন করিয়া একটি চাকচিক্য যেন স্বস্তিলাভ করিয়াছে।

জনগণের একজন বৈজুর কথার উত্তরে, কেবলমাত্র নিজের অস্তিত্ব উপলব্ধির কারণেই বলিল, 'এতেক কথা শিখালে কে বটে হে !' – অন্তর্জলী যাত্রা,পৃষ্ঠা সংখ্যা –৭

- বৈজুনাথ অন্যমনস্ক, তথাপি আপনার দায়িত্বজ্ঞানে হাঁ-হাঁ করিয়া বাধা প্রদান করিতে গিয়াছিল। বালকটির বয়সী সঙ্গীরা বালককে ধরিয়া ফেলিল ; তবুও এখনও, বালক স্বীয় আবেগ সম্বরণ করিতে সমর্থ হয় নাই। একথা সত্য যে, মৃত্যুর গভীরতায়, এক মুহূর্ত্তের জন্য চন্দ্র সূর্য্যকে হারাইবার মত স্থিরতা তাহার নাই। যদিচ, সবুজতা তাহার কাছে নিশুতি রাত্রের ঝিঁ ঝিঁ স্বর এমত, যদিও আপনার নিঃশ্বাস পরিদৃশ্যমান আলোকে আড়াল করিয়াছিল, যদিও স্পর্শবোধ ভোরের পাখীর কণ্ঠস্বরে উধাও। - অন্তর্জলী যাত্রা,পৃষ্ঠা সংখ্যা- ৮
- বালক এ হেন দৃশ্য যে সহিতে পারে নাই, তাহা বৈজুনাথের চোখ এড়াইল না। বালক দৃঢ় করিয়া আপনার নয়নযুগল মুদ্রিত করিল, আপনকার মুষ্টির মধ্যে কাহার মুষ্টি প্রবলভাবে ধরিতে চেষ্টা করিতেছিল। তাহার দেহ প্রদীপের শিখাবৎ। - অন্তর্জলী যাত্রা,পৃষ্ঠা সংখ্যা – ৯
- সঙ্গে সঙ্গে চন্দ্রমাধববাবু এমন ব্যস্ত হইয়া বিলাসের গায়ে হাত দিয়া আদর করিতে গেলেন যে হুইস্কির গেলাসটি প্রায় পড়িয়া যাইতে ছিল। বিলাস গেলাসটি ধরিয়া ফেলিল, চন্দ্রমাধববাবুর বড় আপনার করিয়া তাহাকে আদর করিলেন। - গোলাপ সুন্দরী,পৃষ্ঠা সংখ্যা- ৯২
- বিলাস এখনও গোলাপের নিকটেই, সে কোন প্রকারে উত্তর করিল "হ্যাঁ হ্যাঁ" তাহার উত্তর ভদ্রমহিলাকে সে ক্ষুব্ধ করিয়াছে তাহা সে বুঝিল, কেন না রমণীা আপনার গর্ব্বিত মুখখানি তুলিয়া তাহাকে দেখিয়াছিল। সে ত্বরিতে আপনাকে সামলাইবার জন্য

কহিল "আমার মনটা শ্মশানে পড়ে আছে....ভূষণ আমার চাকর....." – গোলাপ সুন্দরী,পৃষ্ঠা সংখ্যা – ১০১

উপরিউক্ত প্রত্যেকটি উদাহরণ এর সাহায্যে আমরা বুঝতে পারছি উপন্যাস দুটিতে যিনি 'নিরীক্ষণ' করছেন সমস্ত ঘটনা তাঁর অবস্থান কাহিনিতলের ভেতরে কোথাও নয় বরং কাহিনিতলের বাইরে থেকে তিনি সমস্ত কিছু দেখে যাচ্ছেন আর তিনি যা দেখছেন হুবহু আমাদের তা জানিয়ে যাচ্ছেন। ফলে লেখক-ই এখানে কথক হয়ে উঠেছেন।

'অন্তর্জলী যাত্রা' ও 'গোলাপ সুন্দরী' উপন্যাসে কথনের ধরন - আমাদের আলোচ্য উপন্যাসে ঠিক কেমন ধরনের কথন পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে তা আমাদের অনুসন্ধানের বিষয় হয়ে উঠেছে। পূর্ববর্তী 'নিরীক্ষণ' এর বিষয়টি আলোচনা করতে গিয়ে আমরা দেখতে পেলাম 'অন্তর্জলী যাত্রা' আর 'গোলাপ সুন্দরী' উভয় উপন্যাসের ক্ষেত্রেই যিনি 'নিরীক্ষণ' করছেন তিনি কাহিনিতলের বাইরেই অবস্থান করছেন। কথনের বিভিন্ন পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে আমরা দেখেছি যিনি 'নিরীক্ষণ' করছেন তিনি যদি কাহিনিতলের বাইরে অবস্থান করেন তবে মূলত দুধরনের কথন পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে এক সর্বজ্ঞকথন পরিস্থিতি আর নাহলে ভূমিকানুগ কথন পরিস্থিতি। কিন্তু এই দুই ধরনের কথন পরিস্থিতির মধ্যে পার্থক্য হলো ভূমিকানুগ কথন পরিস্থিতির ক্ষেত্রে যিনি 'নিরীক্ষণ' করছেন তিনি কখনও কথক আর কখনও কাহিনিতলের কোনো চরিত্র বা ভূমিকা। ফলে কথকের বহিঃপ্রেক্ষিত এবং কাহিনিতলের ভূমিকাদের অন্তঃপ্রেক্ষিত দিয়ে গড়ে ওঠে ভূমিকানুগ কথন পরিস্থিতির। আমাদের আলোচ্য উপন্যাস দুটিতে যিনি 'নিরীক্ষণ' করছেন তাঁকে কখনই কাহিনিতলের কোনো চরিত্র হয়ে উঠতে

দেখা যায়নি, তাঁর অবস্থান কাহিনিতলের বাইরেই থেকেছে আর তিনি বাইরে থেকেই আখ্যানের পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা দিয়ে গেছেন। ফলে আমাদের আলোচ্য উপন্যাস দুটিতে আসলে সর্বজ্ঞকথন পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। আমাদের বক্তব্যের সাপেক্ষে উপন্যাস থেকে কিছু উদাহরণ দেখে নেওয়ার চেষ্টা করা হল –

- পতিপ্রাণা যশোবতী অপ্রস্তুত হইয়া থামিলেন, এখন তাঁহার শিরায় রক্ত প্রবাহ নিখাদকে কেন্দ্র করিয়া মন্থর গতিতে আবর্ত্তিত হইতেছিল, তিনি সৃষ্টি ও স্থিতির মধ্যবর্ত্তী কোন স্বর যুক্ত করত ভাবিলেন, কি গাহিবেন! - অন্তর্জলী যাত্রা, পৃষ্ঠা সংখ্যা- ৪৫

এখানে যিনি কথক তিনি যশোবতীর মনের সমস্ত কথা বলে যাচ্ছেন। তাঁর মাধ্যমেই আমরা জানতে পারছি যশোবতী অপ্রস্তুত, তার শিরায় রক্ত প্রবাহের গতি মন্থর, সে যে মনে মনে সৃষ্টি ও স্থিতির মধ্যবর্তী কোন স্বর যুক্ত করবে তা ভাবছে তাও কথক আমাদের বলে দিচ্ছেন ফলে আমাদের বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে না যিনি কথক তিনি আসলে সমস্ত কিছুই জানেন অর্থাৎ তিনি সর্বজ্ঞ কথক।

- কিছু কাল অতিবাহিত হইয়াছে, যশোবতী হৃত শক্তি ফিরিয়া পাইয়াছেন। দক্ষিণ হস্তে কাজললতা মুষ্টিবদ্ধ করিয়া কহিলেন, “চাঁড়াল” – এই সম্বোধন-বাক্য তাঁহার কণ্ঠবিবর হইতে ক্ষিপ্ত জন্তুর মতো লম্ফ দিয়া বাহির হইল। - অন্তর্জলী যাত্রা,পৃষ্ঠা সংখ্যা- ৪৯

এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যিনি কথক তিনি আমাদের জানাচ্ছেন যশোবতী হৃত শক্তি ফিরে পেয়েছে। যশোবতী হাতে কাজল লতা শক্ত করে ধরে যখন বলে ‘চাঁড়াল’ সেই সম্বোধন যেন তার গলা থেকে ক্ষিপ্র জন্তুর মতো বেরিয়ে আসে। এই সমস্ত কিছুই আমারা যে কথকের মাধ্যমে জানতে পারছি তিনি উপন্যাসের কোন চরিত্র নয়, তাঁর অবস্থান কাহিনি তলের বাইরে ফলে এখানে কথন সর্বজ্ঞ কথকের জবানীতে।

- বিলাসের সমস্ত দেহ সম্পূর্ণভাবে রোমাঞ্চিত হইয়া আছে। মৃদু শব্দে, ছোট স্পন্দনে সাধারণ হাওয়ায় সে বার বার চমকাইয়া উঠিতেছিল, এমন কি কিছুক্ষণ আগে, ওমিকে চিঠি লিখিবার কালে তাহার অনবরত একাগ্রতা ভাঙ্গিতে ছিল, চিঠি হইতে মুখ ঘুরাইয়া সে বলিয়া উঠিয়াছে "কে?" - গোলাপ সুন্দরী,পৃষ্ঠা সংখ্যা – ৯৩

এখানে যিনি কথক তিনি আমাদের বলে যাচ্ছেন বিলাসের দেহ রোমাঞ্চিত হয়ে আছে। হালকা শব্দে, স্পন্দনে সে বার বার চমকে উঠছে। ওমিকে চিঠি লেখার সময়ও তার একাগ্রতা ভেঙ্গে যাচ্ছিল। এই বর্ণনা থেকে আমরা বুঝতে পারছি যিনি কথক তিনি কাহিনি তলের বাইরে থেকে সমস্ত ঘটনা বলে যাচ্ছেন। ফলে এখানে সর্বজ্ঞ কথন পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে।

- বিলাস এই প্রথম সকালের আলোর জন্য মরিয়া অস্থির ব্যাকুল; এ উন্মত্ততা তাহাকে রমণী করিয়া তুলিল। - গোলাপসুন্দরী,পৃষ্ঠা সংখ্যা – ৯৬

যিনি আমাদের বলছেন বিলাস সকালের আলোর জন্য মরিয়া, ব্যাকুল আমাদের বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে না তিনি কোথাও কাহিনি তলের মধ্যে নেই তিনি কাহিনি তলের বাইরে থেকে বলে যাচ্ছেন ফলে এখানে সর্বজ্ঞ কথন পরিস্থিতির তৈরি হয়েছে।

উপন্যাসের মুক্ত পরোক্ষ বাচন - কমলকুমার মজুমদারের উপন্যাসের কথনশৈলীর আলোচনায় আমরা 'নিরীক্ষণ' আর 'কথন পরিস্থিতি' দেখে নেবার পর এবার আমাদের অনুসন্ধানের বিষয় হল 'বাচন' এর দিকটা। অমিতাভ দাসের 'আখ্যানতত্ত্ব' বইতে আমরা পায় যেকোনো উপন্যাসের ক্ষেত্রে 'বাচন' একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। পাঠকের আগ্রহ, উত্তেজনা, উৎকণ্ঠা, কৌতূহল সমস্ত কিছুই নির্ভর করে 'বাচন' এর উপর। তাই এই 'বাচন' এর নির্মাণে প্রত্যেক সাহিত্যিকই কমবেশি যথেষ্ট যত্নবান থাকেন,

কমলকুমারও এর ব্যতিক্রম নন। এই 'বাচন' এর নির্মাণে তিনি আপন ভাষাশৈলীর মাধুর্য মিশিয়ে অসাধারণত্ব প্রকাশ করেছেন। এই 'বাচন' এর আলোচনায় আমরা মূলত 'মুক্ত পরোক্ষ বাচন' বিষয়টিকে আমাদের গবেষণার অন্তর্ভুক্ত করেছি।

অমিতাভ দাসের 'আখ্যানতত্ত্ব' বইতে যে আলোচনা আছে সেখানে আমরা দেখেছি আখ্যানের গঠনের ক্ষেত্রে 'মুক্ত পরোক্ষ বাচন' (free indirect discourse) একটি গুরুত্বপূর্ণ ভাষা উপাদান। এই ভাষা উপাদান আখ্যানের ক্ষেত্রে নতুন মাত্রা এনে দেয়, এর উপস্থিতি আখ্যানকে আরও সমৃদ্ধ করে তোলে। 'প্রত্যক্ষ বাচন' আর 'পরোক্ষ বাচন' এর সাথে কমবেশি আমরা সকলেই পরিচিত। কাহিনির মধ্যবর্তী কোনো ভূমিকা বা চরিত্রের সংলাপকে আমরা 'প্রত্যক্ষ বাচন' বলতে পারি। ঠিক তেমনি ভাবে কথক যখন আখ্যান কথনে অন্য কোনো ভূমিকার দৃষ্টিকোণ ব্যবহার করে তার সাহায্যে সমগ্রত অথবা অংশত কাহিনি উপস্থাপিত করে তখন ঐ ভূমিকার সংলাপ উপাদানকে উদ্দিষ্ট কথকের 'পরোক্ষ বাচন' বলতে পারি। তবে 'মুক্ত পরোক্ষ বাচন' এর ধারণাটা এর থেকে একটু আলাদা। 'মুক্ত পরোক্ষ বাচন' বলতে সাধারণত বোঝায়, যখন কথকের পরোক্ষ বাচনের মধ্যে আখ্যানের কোনো চরিত্র বা ভূমিকার প্রত্যক্ষ বাচন 'মুক্ত' বা 'স্বাধীন ভাবে' ব্যবহৃত হয় তাকেই।

আমাদের আলোচ্য দুটি উপন্যাসে 'মুক্ত পরোক্ষ বাচন' কীভাবে এসেছে তা কিছু উদাহরণের সাহায্যে অনুসন্ধানের চেষ্টা করা হল —

- যশোবতীর চক্ষুর্দ্বয় বিস্ময়ে ভরিয়া গেল, জীবনে এই বোধ হয় প্রথম হাসি আসিল, পাছে অন্য কোন লোক তাঁহার হাসি শুনিতে পায়, সেই হেতু মুখে সত্বর বস্ত্রপ্রদান করিয়াছিলেন। - অন্তর্জলী যাত্রা,পৃষ্ঠা সংখ্যা – ৩৩

- বৈজুনাথের ডাকে লক্ষ্মীনারায়ণ যেন বা মুক্ত আকাশ দেখিলেন, কন্যাকে তদবস্থায় রাখিয়া কয়েক পদ আসিয়া মনে হইল যেন আপন গৃহদ্বারে পৌঁছিয়াছেন। - অন্তর্জলী যাত্রা,পৃষ্ঠা সংখ্যা – ৩৪

- চণ্ডালের চোখে জল ছিল না, তবু যেন তাহার মনে হইল তাহার চোখে জল আছে, সে হাত দিয়া চক্ষু মুছিয়া কহিল, "বললাম হে....তুমি গুঁড়ি দশ বার যোগাড় কর, চেলা ক'গাড়ি যারা আসবে সবাই কাঠ আনবে বয়ে গো। আগে আমার মনে পড়েনি....তুমি...." –অন্তর্জলী যাত্রা,পৃষ্ঠা সংখ্যা – ৩৫

- মোহিতের এ প্রশ্ন বিলাসের নিকট রূঢ় বিদ্রূপ হইয়া দেখা দিল, সে কঠিন ভাবে চাহিতে জানে না শুধুমাত্র আপনার সৃজিত পৃথিবীতে চিত্রার্পিতের মত দাঁড়াইয়া রহিল। - গোলাপ সুন্দরী,পৃষ্ঠা সংখ্যা – ৮৫

- রঙ্গস্বামীকে হলের অস্থিরতা যারপরনাই বিমূঢ় করিয়াছিল, কর্ত্তব্যজ্ঞান সত্ত্বেও তিনিও হয়ত বা মুগ্ধ হইয়াছিলেন। - গোলাপ সুন্দরী,পৃষ্ঠা সংখ্যা – ৮৭

উপরের প্রত্যেকটি উদাহরণে আমরা দেখতে পাচ্ছি যিনি কথক তিনি চরিত্রের মনের কথা বলে দিচ্ছেন। প্রথম উদাহরণে আমরা কথকের মাধ্যমে জানতে পারছি যশোবতীর চোখ বিস্ময়ে ভরে গেছে, দ্বিতীয় উদাহরণে দেখছি লক্ষ্মীনারায়ণ বৈজুনাথের ডাকে মুক্ত আকাশ দেখছে, তৃতীয় উদাহরণে আমরা দেখছি চণ্ডালের চোখে জল ছিল না তবু তার মনে হল চোখে জল আছে, চতুর্থ উদাহরণে আমরা দেখছি মোহিতের প্রশ্ন বিলাসের কাছে রূঢ় বিদ্রুপ হয়ে দেখা দিল এবং পঞ্চম উদাহরণে দেখছি হলের অস্থিরতা রঙ্গস্বামীকে বিমূঢ় করেছে। এই সমস্ত কিছুর মধ্যে দিয়ে এখানে 'মুক্ত পরোক্ষ বাচন' তৈরি হয়েছে।

কাহিনি বলার কৌশল – ড.উদয়কুমার চক্রবর্তী ও ড.নীলিমা চক্রবর্তী তাঁদের 'ভাষাবিজ্ঞান' বইতে বলেছেন যে কোনো আখ্যানের কাহিনি গঠিত হয় মূলত দুটি অংশ নিয়ে, একটি হল বর্ণনা অংশ আর অপরটি হল সংলাপ অংশ। কমলকুমার মজুমদার এর উপন্যাসে কাহিনি বলার কৌশলটি কেমন ধরনের তা আমাদের অনুসন্ধানের বিষয় হয়ে উঠেছে। আমাদের আলোচ্য উপন্যাস 'অন্তর্জলী যাত্রা' ও 'গোলাপ সুন্দরী' এর থেকে কিছু উদাহরণ এর সাহায্যে আমরা কমলকুমারের কাহিনি বলার ধরনটি অনুসন্ধান করব —

ক. বর্ণনা অংশ

কমলকুমারের 'অন্তর্জলী যাত্রা' ও 'গোলাপ সুন্দরী' উপন্যাসে আমরা প্রথমেই কাহিনি বলার যে ধরনটি পাচ্ছি তা হল বর্ণনা অংশ —

- লক্ষ্মীনারায়ণ এমত মনে হয় বৃক্ষরোপণ দেখেন নাই, হরিৎক্ষেত্র বলিতে কোন পাখী অথবা নদীর নাম বুঝায় তাহা যেন তাঁহার জানা নাই, মেলা খেলায় বাজিকরকে ডম্বরু বাজাইতে দেখিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। — অন্তর্জলী যাত্রা,পৃষ্ঠা সংখ্যা – ১৬
- বৃদ্ধের দৈহিক জ্ঞান বিষয়ে অনন্তহরি অত্যধিক আস্থাবান; লক্ষ্মীনারায়ণ অনবরত দূর্গা নামে ব্যস্ত, তৎসহ তাঁহার করজোড় কভু বক্ষস্থলে ক্বচিৎ কপালের আজ্ঞাচক্রে আবেগ উত্তেজনায় উঠানামা করিতে লাগিল। — অন্তর্জলী যাত্রা,পৃষ্ঠা সংখ্যা – ২৩
- বৃদ্ধ সীতারাম তখনও কাঁদিতেছিলেন ; ধীর বিলম্বিত লয়ে ক্রন্দনের ধারা শূন্যতায় উঠে নামে। — অন্তর্জলী যাত্রা,পৃষ্ঠা সংখ্যা – ৫৫
- একটি যুদ্ধ স্থির নিশ্চয় জয়পরাজয়ের মত সময় গিয়াছে ; ভূষণের স্ত্রীর অবশিষ্ট আর কিছু হয়ত আছে, তথাপি বিলাস যেমত বা একই সময়ের মধ্যে স্থিতিলাভ করিয়া আছে,

লোকগীতির মত বিলাপমুখর ক্রন্দনধ্বনি তাহাকে জড়ীভূত করিয়াছে, সে এখন গোলাপের নিকটেই, চক্ষু তাহার বন্ধ ছিল। — গোলাপ সুন্দরী,পৃষ্ঠা সংখ্যা – ১০১

- বিলাস এখন আপনার ঘরে জানালা খুলিয়া দাঁড়াইয়াছিল। এমত সময়, প্রবল মেঘ – ঘর্ষণ শুনিল ; সঙ্গে সঙ্গে দৃষ্টি ফিরাইয়া দেখিল যেটুকু আলো ছিল তাহাও নাই এবং কে যেন ত্রাসে ভয়ে এইমাত্র দ্রুত পদক্ষেপে যাওয়া - আসা করিতেছে। — গোলাপ সুন্দরী,পৃষ্ঠা সংখ্যা – ১০৩

উপরের সবকটি উদাহরণে লেখক সর্বজ্ঞ হয়ে উদাহরণ দিচ্ছেন কারণ আমরা কিছুক্ষণ আগেই দেখেছি 'অন্তর্জলী যাত্রা' ও 'গোলাপ সুন্দরী' দুটি উপন্যাসের 'নিরীক্ষণ' সর্বজ্ঞ কথকের দৃষ্টিতে।

খ. সংলাপ অংশ : সংলাপ অংশ তিন ভাবে দেখা যায় বলে উল্লেখ করেছেন ড. উদয় কুমার চক্রবর্তী ও ড. নীলিমা চক্রবর্তী। যথা –

১। সরাসরি সংলাপ, এর আগে ও পরে কোনো বর্ণনা অংশ জুড়ে দেওয়া নেই।

২। সংলাপ অংশের আগে বর্ণনা অথবা সংলাপ অংশের পরে বর্ণনা।

৩। সংলাপ অংশ মাঝখানে, শুরুতে বর্ণনা আর শেষে বর্ণনা।

আমাদের আলোচ্য উপন্যাস থেকে সংলাপের উপরিউক্ত ধরন গুলি অনুসন্ধান আমাদের আলোচনার বিষয় হয়ে উঠেছে কিছু উদাহরণ উল্লেখ করা হল —

সংলাপ অংশ :

- "কেন পাব না শুনি ... ওঃ ওনার কথায় ..."

  " না পাবে না ... ভাব আমি ঘাস খাই ... বুঝি না ... না?"

"বলি বোঝাটা কি শুনি ... মাঢ়ভোতা বুদ্ধি ..."

"খবরদার বলছি ... চোর কোথাকার !"

"এই মুখ সামলে ... না হলে আমি খড়ম পেটা ..."

— অন্তর্জলী যাত্রা,পৃষ্ঠা সংখ্যা – ২০

- " এখন না মরে আমার উপায় কি বলতে পার...আমায় ফেন দেবার লোক কই..."

"তোমার কেউ নেই...তোমাদের জাতে কুটুম..."

"আমাদের, কেউ থাকে না..."

"বড় ডাগর জটাধারী কথা গো, গঙ্গার সামনে দাঁড়িয়ে বলতে পার..."

— অন্তর্জলী যাত্রা, পৃষ্ঠা সংখ্যা – ৬৫

- "আহা থাক চন্দ্রমাধববাবু....."

"কি সর্বনাশ গো ..... তোমার ত বড্ড অসুবিধে হচ্ছে.....

একমাত্র চাকর ভরসা.....তা তার বৌ মরবে কবে ?"

"এখন ভূষণ বলছে গণৎকার বলছে.....একাদশী – দ্বাদশী কাটলে হয়"

"বাঃ সিদে কথা হ্যারে তা মরবে, কত কাঠ যোগাড় করেছিস....."

— গোলাপ সুন্দরী,পৃষ্ঠা সংখ্যা – ৯৩

- "হুজুর—"

"আমি চলে যাব—"

"সাপ টাপ—"

"আঃ—থাক"

— গোলাপ সুন্দরী, পৃষ্ঠা সংখ্যা – ৯৯

সংলাপ অংশের আগে বর্ণনা :

- সুতরাং সে এই শ্মশানভূমি নির্দ্দেশ করিয়া কহিল, "তুমি কিভাবে মন রাত্তদিন শুধু জোড় খায় ঠাঁই।" — অন্তর্জলী যাত্রা,পৃষ্ঠা সংখ্যা- ৭
- রুদ্ধশ্বাস-স্তব্ধতা দেখা দিল, বৈজু পুনরায় বলিল, "ভাঙার শব্দ হলে ইদিক পানে আর চাহিবে না গো, শুধু হরি বোল দিবে...হরি বোল।" — অন্তর্জলী যাত্রা, পৃষ্ঠা সংখ্যা – ৮
- সঘন ট্রাজিডি অভিনেতার মতই টেবিলের সবুজ বনাতের উপর দিয়া বার বার ঘুরাইয়া গভীর কণ্ঠে বলিতে লাগিলেন "ভগবান ধন্যবাদ যে তুমি এই শতাব্দীতে জন্মেছ...(তবু এখানে রঙ্গস্বামীর স্বর নিদাঘের দ্বিপ্রহরের ফেরিওয়ালার ডাকের মতই ক্লান্ত শোনাইল) যখন দিন দিন রাত্র রাত্র—আপনার সহজ রূপে এসেছে; বহু মহাপুরুষকে তুমি স্মরণ করতে পারো, বহু বহু যুগে যে কোন মুহূর্ত্তে তুমি চলে যেতে পারো, যে কোন বাস্তবকে তুমি কল্পনা করে নিতে পারো...আমার বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে এই যে..." — গোলাপ সুন্দরী, পৃষ্ঠা সংখ্যা – ৮৫
- বিলাস হরিণশাবকের মত করিয়া মুখখানি তুলিয়া কহিল "কেমন করে বলি আপনাকে....." — গোলাপ সুন্দরী,পৃষ্ঠা সংখ্যা – ৮৬

সংলাপ অংশের পরে বর্ণনা :

- "মড়া দেখি দেখি আমি মাটি হইছি গো, আমি তো শব গো, বহুদিন মরে আছি হে.....লাও বাবু মশায়, তোমাদেরই ই চিত্রা ত এখন গোড়া গাঁথছে, খোঁকাকে লিয়ে উঠাঁই....." বলিয়া বৈজু গঙ্গার দিকে অগ্রসর হইল। — অন্তর্জলী যাত্রা,পৃষ্ঠা সংখ্যা – ৯

- "থাক থাক, চুপ কর বেটা" লক্ষ্মীনারায়ণ বলিলেন, কেন না তিনি আশায় উত্তেজনায় অসহিষ্ণু হইয়াছিলেন, অবাধ্য অনন্তহরির অঙ্কের ফলাফলের প্রতি তাঁহার মন ছিল না। — অন্তর্জলী যাত্রা, পৃষ্ঠা সংখ্যা – ১৩

- "আমি অনেক দূরে চলে যাচ্ছি.....ভগবানকে বিশ্বাস ক'রো " রঙ্গস্বামী বলিতেছিলেন। — গোলাপ সুন্দরী,পৃষ্ঠা সংখ্যা – ৮৬

- "ও না পাগল, ড্রাইভার...গাড়ী চালাও...রিকয়েল করবে না..." ওমি বলিয়াছিল। — গোলাপ সুন্দরী, পৃষ্ঠা সংখ্যা – ৮৯

সংলাপ অংশের আগে ও পরে বর্ণনা :

- বৈজু পুনর্ব্বার বলিল, "কেঁদোনি খোকা, একটি গল্প শুন — যে দিলে সেই নিলে,তুমাকে ভাল'র মধ্যে লোভী করে দিলে, কি করবে হে" — তাহার গলার স্বরে সহজ ঠিকানা ছিল, — অন্তর্জলী যাত্রা,পৃষ্ঠা সংখ্যা – ৯

- বৈজুনাথ ইঁহাদের অবস্থা দেখিয়া খানিক বিশ্বাস লাভ করিয়া পুনরায় আরম্ভ করিল, "কত কটা ডাগর সতীদাহ হল বল, লোকে শাঁখ বাজালে, উলু দিলে, আমার শ্বশুর বলত শ'শয়ে গেছে, আমি যেমন এ ঘাটকে জামাই হই এলাম —তারপর কত কটা গেল" বলিয়া গঙ্গা ছাড়িয়া উঠিয়া আসিয়া থমকাইয়া দাঁড়াইল। — অন্তর্জলী যাত্রা, পৃষ্ঠা সংখ্যা – ১২

- মোহিত কি যেন বলিতে গিয়া খুব সাধারণ করিয়া উত্তর করল "হ্যাঁ ..... আমার কাছে আমি যে অত্যন্ত ফেমাস ম্যান" বলিয়া হাসি দিয়া আপনার উচ্ছল রসিকতাকে বাঁধান দিল না, — অন্তর্জলী যাত্রা,পৃষ্ঠা সংখ্যা – ৮৪

স্মৃতিচারণা – কমলকুমার মজুমদার তাঁর কথনশৈলীর নির্মাণে নানা ধরনের বৈচিত্র্য এনেছেন তাঁর মধ্যে বিভিন্ন চরিত্রের 'স্মৃতিচারণা' এই ব্যাপারটিও গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের আলোচ্য উপন্যাস 'অন্তর্জলী যাত্রা' ও 'গোলাপ সুন্দরী' উপন্যাসে যে সমস্ত চরিত্র পেয়েছি তাদের মধ্যে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হল যশোবতী, বৈজুনাথ, বিলাস। উপন্যাসে এদের নানা ভাবে আমরা স্মৃতিচারণা করতে দেখি। আলোচ্য উপন্যাস থেকে কিছু উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টি অনুসন্ধানের চেষ্টা করব —

- বৈজুনাথ আত্মসম্বরণ করিল, জাগিল; সমস্ত, প্রতিবিম্বিত দীপ্তিতে, আধোউদ্ভাসিত বর্ত্তমানতা সমাকীর্ণ উদ্ভট ব্যাকুল দৃশ্যমানতা অবলোকনে তাহার মনে হয়, আপনার স্বপ্নকে লইয়া এখানেই ঘর করিবে, কেননা এই লোক চরাচর তাহার স্যাঙাৎ, ইহার সহিত তাহার বহুকালের প্রণয়, তথাপি যাহাকে কিছুক্ষণ পূর্ব্বে আপন আত্মম্ভরি মনে, 'পৃথিবীটা খুব বড়' বলিতে রোমাঞ্চিত হয়, কেননা সে ঐ সূত্রে সুমহান বিরাটত্ব অনুভবে ক্ষণমাত্র বীতচেতন। — অন্তর্জলী যাত্রা, পৃষ্ঠা সংখ্যা- ৫৪

  'আত্মসম্বরণ করিল', 'জাগিল' এই ক্রিয়াগুলি থেকে বুঝতে পারা যাচ্ছে বৈজুনাথ নিজেকে জাগিয়ে তুলছে আর ভাবছে তার স্বপ্নকে নিয়ে, এই শ্মশানেই ঘর করবে কারণ এই স্থানটাকেই সে চেনে অনেক দিন ধরে, বিরাট পৃথিবীর ভাবনায় সে নিজেকে হারিয়ে ফেলছে। বৈজুনাথের এই ভাবনার মধ্যে দিয়ে কমলকুমারের গদ্য শৈলীর মধ্যে 'স্মৃতিচারণা'-র রীতিটি আমরা প্রত্যক্ষ করতে পারছি।

- একদা যশোবতীর বিবাহের পূর্ব্বে, এক রাত্রে সে ভেড়ীপথ হইতে অন্তর্জলীসূত্রে আনীত, সীতারামকে কেন্দ্র করিয়া কীর্ত্তন পরিক্রমণ দেখিয়াছিল; চক্রাকারে ভ্রমণকে মাঝে মাঝে শ্মশানের চিতার আলোকচ্ছটা উল্লেখ করিতেছিল, আর কুয়াশাবৃত চন্দ্রালোকে যাহা প্রহেলিকা। মন্দিরগাত্রে রাশমণ্ডলের আলেখ্যর ন্যায় সমস্ত সংস্থান,

নেহাৎ সহজ হইলেও উহা অতিকায়, উহা ভয়প্রদ। সেই অনুভূতির কথা মনে করিয়া বৈজুনাথ এখন শুষ্ক, দুর্ব্বল; তাহার কেমন যেন মনে হইল সে কীর্ত্তণের চক্রকে ভেদ করিয়া আসিয়াছে; সত্যই, সে শঙ্কিতচিত্তে আপনার চারিপার্শ্বে লক্ষ্য করিল। সত্যই সেই রহস্যময়, মস্তক আবৃত, শীতকুণ্ঠিত লোকগুলি ভ্রাম্যমাণ কিনা! — অন্তর্জলী যাত্রা, পৃষ্ঠা সংখ্যা – ৫৬

এখানে যশোবতীর বিয়ের আগের একটি ঘটনা বলা হচ্ছে। 'দেখিয়াছিল', 'করিয়াছিল' ক্রিয়ার মাধ্যমে আমরা বুঝতে পারছি আগে ঘটে যাওয়া কোনো ঘটনার কথা বলা হচ্ছে। আসলে এখানে যশোবতীর সঙ্গে সীতারামের বিয়ের আগে যখন তাকে অন্তর্জলীর জন্য শ্মশানে আনা হয়েছিল সেই সময়ের একদিনের কীর্ত্তনের স্মৃতির কথা বৈজুনাথ এর মনে করার কথা আমরা পাচ্ছি ফলে এর মধ্য দিয়ে কমলকুমারের গদ্য শৈলীতে 'স্মৃতিচারণা' – র রীতিটি প্রত্যক্ষ করতে পারছি।

- অনেকক্ষণ পর ইতস্ততঃ করিয়া সহসা কি যেন বা তাঁহার, বৃদ্ধের, স্মরণ হয়; ফলে তিনি অবিচারিত চিত্তে বলিলেন, "আচ্ছা বউ, আমাদের ফুলশয্যা..." এবম্প্রকারের কথা বলিবার পরক্ষণেই তাঁহার সম্ভবত লজ্জা হইল। — অন্তর্জলী যাত্রা, পৃষ্ঠা সংখ্যা – ৬৬

এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি অন্তর্জলীর জন্য শ্মশানে আনা সীতারামের সঙ্গে যশোবতীর বিয়ে হলেও ফুলশয্যা হইনি। সীতারামের মৃত্যু আসন্ন কিন্তু তার মনে যে ফুলশয্যার ইচ্ছা আছে তা তার ফুলশয্যার কথা স্মরণ হবার মধ্যে দিয়ে আমরা বুঝতে পারি আর 'স্মৃতিচারণা' – র রীতিটিও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

- বিলাসের মনে হইল, ছেলেবেলার জ্বর উপশমে প্রথম মাগুর মাছের তেজপাতা জীরে মরিচ বাটা ঝোলের মধ্যে যে-রূপ মুখচোরা লাজুক পৃথিবীর নিমন্ত্রণটি থাকিত, এখানেও

মোহিতের উক্তির মধ্যে সেই বাহু বিস্তার করা স্বাগতম স্বাগতম ধ্বনিটি ছিল। — গোলাপ সুন্দরী, পৃষ্ঠা সংখ্যা- ৯০

'গোলাপ সুন্দরী' উপন্যাসের এই অংশে আমরা দেখতে পাচ্ছি বিলাসের মনে পরে যায় ছোটোবেলায় জ্বরের সময় খাওয়া তেজপাতা জীরে মরিচ বাটা দিয়ে খাওয়া মাগুর মাছের ঝোলের স্বাদ। সেই স্বাদের মধ্যে সে মুখচোরা লাজুক পৃথিবীর নিমন্ত্রণ অনুভব করে এবং তার সাথে মোহিতের উক্তিকে মিলিয়ে দিয়ে স্বাগতম ধ্বনি অনুভব করে। বিলাসের ছোটোবেলার স্মৃতি মনে করার মধ্যে দিয়ে আমরা এখানে 'স্মৃতিচারণার' – র রীতিটি প্রত্যক্ষ করতে পারছি।

- বিলাস এখনও ঝরিয়া পড়া রক্ত দেখিতেছিল, অনেকদিন পূর্ব্বে বিদ্যুতের আলোয় আর একজনের মুখে এরূপ রক্ত দেখিয়াছে,—সে আত্মারাম। বেচারী আত্মারাম, অনেক কথাই বিলাসের মনে পড়িল, যখন প্রায় সে হার স্বীকার করিয়া আসিয়াছে, তখন কোথা হইতে একটি থারমোমিটার সে যোগাড় করিয়াছিল, আপনার টেম্পারেচার দেখিয়া রুদ্ধশ্বাসে জিগির দিয়া উঠিল "নর্ম্মাল নর্ম্মাল—দেখ ডাক্তার" রঙ্গস্বামী তাহার থারমোমিটার দেখিয়া কিছুটা সন্দেহের বশে অন্য রোগীকে দিলেন, সেখানেও 'নর্ম্মাল'; এবং সঙ্গে সঙ্গে নিজের থারমোমিটার বাহির করিতেই ব্যাপারটা যেন তাঁহার বোধগম্যে আসিল। — গোলাপ সুন্দরী, পৃষ্ঠা সংখ্যা – ৮৭

'গোলাপ সুন্দরী' উপন্যাসের এই অংশে আমরা 'অনেক দিন পূর্ব্বে', 'মনে পড়িল' এই গুলির মধ্যে দিয়ে বুঝতে পারি এখানে অনেক আগে ঘটে যাওয়া কোনো ঘটনার কথা বলা হচ্ছে। বিলাসের নিজের ঝরে পরা রক্ত দেখে তার অনেক দিন আগে আত্মারামের মুখে দেখা রক্তের কথা মনে পরে যায়। এই মনে পরার মধ্যে দিয়ে আমরা 'স্মৃতিচারণা' এর রীতিটি প্রত্যক্ষ করতে পারছি।

প্রায়–ভাষার ব্যবহার — ড. উদয় কুমার চক্রবর্তী ও ড. নীলিমা চক্রবর্তী তাঁদের 'ভাষাবিজ্ঞান' বইতে শৈলীবিজ্ঞান নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে আমাদের 'প্রায় ভাষা' এর কথা বলেছে। 'প্রায় ভাষা' বা 'Paralanguage' হল আকার ইঙ্গিতের ভাষা। কমবেশি সব সাহিত্যিকিই বক্তা ও শ্রোতার মানসিক ক্রিয়া – প্রতিক্রিয়া কীভাবে শরীরের নাড়াচাড়ায় প্রকাশ পায় তা তাঁদের লেখায় প্রকাশ করে থাকেন, কমলকুমারও এর ব্যতিক্রম নন। 'অন্তর্জলীযাত্রা' ও 'গোলাপসুন্দরী' উপন্যাসে কমলকুমারের ব্যবহৃত 'প্রায় ভাষা' আমাদের অনুসন্ধানের বিষয়। উক্ত উপন্যাস থেকে এই 'প্রায় ভাষা'–র কিছু দৃষ্টান্ত দেখে নেব এবার—

- "অনন্ত" কম্পিতকণ্ঠে লক্ষ্মীনারায়ণ অনন্তহরির উত্তেজনার প্রতিক্রিয়ার বেগ সামলাইতে না পারিয়া ডাকিয়া ছিলেন। — অন্তর্জলী যাত্রা, পৃষ্ঠা সংখ্যা – ১৪

  এখানে 'কম্পিতকণ্ঠে' বলার মধ্যে 'প্রায় ভাষা' এর ব্যবহার লক্ষ্য করা যাচ্ছে। কম্পিতকণ্ঠে বলার মধ্যে লক্ষ্মীনারায়ণের মধ্যে কোথাও যে একটা ভয় কাজ করছে বোঝা যাচ্ছে।

- জ্যোতিষীর এখনও ধ্যানস্থ অবস্থা, দৃঢ়কণ্ঠে উত্তর করিলেন, "দোসর!" — অন্তর্জলী যাত্রা, পৃষ্ঠা সংখ্যা – ১৪

  এখানে 'দৃঢ়কণ্ঠে' বলার মধ্যে 'প্রায় ভাষা' – র ব্যবহার লক্ষ্য করা যাচ্ছে। জ্যোতিষীর দৃঢ় কণ্ঠে বলার মধ্যে দিয়ে বোঝা যাচ্ছে তার কথা বলার মধ্যে প্রত্যয় আছে।

- বৈজুনাথ যে দুই কলস মদ আনিয়াছিল তাহার একটি হইতে নরকপালে ঢালিয়া পান করিল, পরক্ষণে নরকপালের দিকে চাহিয়া বিড় বিড় করিয়া কি যেন বা বলিল,

  আড়ষ্ট নিঃশ্বাস-কণ্ঠস্বরে পাতা পোড়ার শব্দ, যাহা শুদ্ধ ভাষায় সম্ভবত বলিয়াছিল, "হায়

কার অঞ্জলিবদ্ধ হাত, তুমি হাড় হয়ে আছ। এ কপাল কাহাকে আহ্বান করে। মন কি সকল সময় উর্দ্ধলোকে — সেখানে যায়!" — অন্তর্জলী যাত্রা, পৃষ্ঠা সংখ্যা – ৫০

এখানে বৈজুনাথের 'বিড় বিড় করিয়া' বলার মধ্যে 'প্রায় ভাষা' এর ব্যবহার লক্ষ্য করা যাচ্ছে। বিড় বিড় করে বলার মধ্যে দিয়ে তার মধ্যের বিরক্তি প্রকাশ পাচ্ছে।

- এ হেন বাক্যে অনার্য্য চণ্ডালের শিরা-উপশিরা হা-হা করিয়া উঠিল, আজন্ম ক্ষুৎপিপাসা কাতর তাহার মন, কথাগুলিকে যেমত বা আহার করিবার মানসে আঘ্রাণ করিল এবং উত্তর দিল, "দয়া মায়া..." এ উচ্চারণে ভ্রূভঙ্গ ছিল। — অন্তর্জলী যাত্রা, পৃষ্ঠা সংখ্যা – ৫২

এখানে চণ্ডালের 'শিরা-উপশিরা হা-হা করিয়া উঠিল' বলার মধ্যে 'প্রায় ভাষা' এর ব্যবহার লক্ষ্য করা যাচ্ছে। হা-হা করে উঠল বলার মধ্যে দিয়ে তার শরীরের ভেতর কোথাও শূন্যতা তৈরি হয়েছে বোঝা যাচ্ছে।

- যশোবতী চণ্ডালের গতিবিধি অনুসরণ নিমিত্ত এখনও সেখানেই; আপনার ছায়ার প্রতি তীব্র ভ্রূকুঞ্চিত দৃষ্টি হানিয়া বৈজুনাথকে দেখিলেন, যাহার গাত্রবস্ত্র, গামছা, আলুলায়িত যাহা মন্থর বায়ুতাড়িত। — অন্তর্জলী যাত্রা, পৃষ্ঠা সংখ্যা – ৫৩

এখানে যশোবতীর নিজের ছায়ার দিকে 'তীব্র ভ্রূকুঞ্চিত দৃষ্টি' দিয়ে দেখার মধ্যে 'প্রায় ভাষা' – র ব্যবহার লক্ষ্য করা যাচ্ছে। বৃদ্ধ সীতারামের সঙ্গে বিয়ে হলেও যশোবতীর মনে বৈজুনাথের প্রতিও যে দুর্বলতা তৈরি হয়েছিল অর্থাৎ 'তীব্র ভ্রূকুঞ্চিত দৃষ্টি' দিয়ে দেখার মধ্যে দিয়ে যশোবতীর মনের দ্বান্দিকতা আমাদের সামনে ফুটে উঠেছে।

- এ এক অদ্ভুত স্থান হইতে তিনি আর এককে ডাকিতেছেন, যে মানুষ তাঁহার আসন্ন ভীতি হইতে রক্ষা করিবে। এ স্থান লতা গুল্ম তৃণ বৃক্ষে আচ্ছন্ন, আর তিনি একটি 'বেশী প্রকাশ'। এ ভাবনায় তাঁহার দেহ দুলিয়া উঠিল, তথাপি আত্মসম্বরণ করিলেন। — অন্তর্জলী যাত্রা, পৃষ্ঠা সংখ্যা – ৬৪

এখানে যশোবতীর কথা বলা হয়েছে। তার 'দেহ দুলিয়া উঠিল' বলার মধ্যে 'প্রায় ভাষা'- র ব্যবহার লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এখানে যশোবতীর দেহ রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠার কথা আমরা বুঝতে পারছি 'দেহ দুলিয়া উঠিল' 'প্রায় ভাষা' এর ব্যবহারের মধ্যে দিয়ে।

- ক্রমাগত পাখী ডাকিতেছে, হাওয়া ছিন্নভিন্ন; সীতারাম যেন প্রাণ লাভ করিয়া শ্বাসটানা কণ্ঠে ভোরাই গাহিতেছিল, "রাই জাগো রাই জাগো।" — অন্তর্জলী যাত্রা, পৃষ্ঠা সংখ্যা – ৬৫

এখানে 'শ্বাসটানা কণ্ঠে' ভোরাই গাওয়ার মধ্যে 'প্রায় ভাষা' এর ব্যবহার লক্ষ্য করা যাচ্ছে। সীতারামের মৃত্যু আসন্ন তবুও তার গান করার ইচ্ছে। তার প্রাণ বায়ু প্রায় নিঃশেষ হয়ে এসেছে সেটা বোঝা যাচ্ছে এই 'শ্বাসটানা কণ্ঠে' গান করার মধ্যে দিয়ে।

- বিলাস যেমন করিয়া ডাক্তারের সহিত এতদিন ধরিয়া কথা বলিয়াছে, তেমনি ওষ্ঠদ্বয় কাঁপাইয়া ধীরে ধীরে কহিল " এম এম এম, এত মোনগ্রাম তোমার ভাল লাগে" — গোলাপ সুন্দরী, পৃষ্ঠা সংখ্যা – ৮৪

এখানে বিলাসের 'ওষ্ঠদ্বয় কাঁপাইয়া' কথা বলার মধ্যে 'প্রায় ভাষা' এর ব্যবহার লক্ষ্য করা যাচ্ছে। বিলাস যক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত, তার শরীর যে দুর্বল সেটা বোঝা যাচ্ছে কথা বলার সময় তার ঠোঁট কেঁপে যাবার মধ্য দিয়ে।

- বিলাস সহাস্যে কহিল "কি নির্দ্দয় তুমি" বলিয়া সে কাগজটি ধীরে আপনার পকেটে রাখিয়া দিল...এবং চেট্টির একটি হাত লইয়া আপনার সুন্দর গণ্ডদেশে বুলাইয়াছিল। — গোলাপ সুন্দরী, পৃষ্ঠা সংখ্যা – ৮৮

  এখানে 'বিলাস সহাস্যে কহিল' এর মধ্যে 'প্রায় ভাষা' এর ব্যবহার লক্ষ্য করা যাচ্ছে। বিলাসের সহাস্যে বলার মধ্যে দিয়ে তার মনের প্রফুল্লতা আমাদের সামনে ফুটে উঠেছে।

- হলের অবস্থা যখন প্রায় শান্ত তখন ওমি বিলাসকে জোর করিয়া ধরিয়া পুনরায় করিডোরে আসিল। — গোলাপ সুন্দরী, পৃষ্ঠা সংখ্যা – ৮৮

  এখানে 'জোর করিয়া ধরিয়া' বলার মধ্যে 'প্রায় ভাষা' এর ব্যবহার লক্ষ্য করা যাচ্ছে। ওমি বিলাসকে জোর করে ধরে করিডোরে নিয়ে যাচ্ছে এর মধ্যে দিয়ে ওমি যে বিলাসকে বল প্রয়োগ করে করিডোরে নিয়ে যাচ্ছে বোঝা যাচ্ছে।

- এর উত্তরে চন্দ্রমাধববাবু চেয়ারে সজোরে চাপড় মারিয়া কহিলেন "আঃ কচে বারো...দারুণ বলেছ...হ্যাঁগো গোলাপের কতদূর, খবর নেওয়া হয় না..." — গোলাপ সুন্দরী, পৃষ্ঠা সংখ্যা – ৯২

  এখানে চন্দ্রমাধববাবুর 'চেয়ারে সজোরে চাপড় মারিয়া কহিলেন' এর মধ্যে 'প্রায় ভাষা' এর ব্যবহার লক্ষ্য করা যাচ্ছে। চেয়ারে সজোরে চাপড় মারার মধ্যে দিয়ে আমরা চন্দ্রমাধববাবুর মধ্যের উত্তেজনাকে উপলব্ধি করতে পারছি।

- রুপবান বিলাস তাঁহার বাক্যে ঘর্ম্মাক্ত হইয়া গেল। — গোলাপ সুন্দরী, পৃষ্ঠা সংখ্যা – ১০৩

এখানে বিলাসের ঘর্ম্মাক্ত হওয়ার মধ্যে ‘প্রায় ভাষা’ এর ব্যবহার লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এই ঘর্ম্মাক্ত হবার মধ্যে দিয়ে বিলাসের ভেতরের উত্তেজনা, চিন্তা আমাদের সামনে প্রকাশিত হচ্ছে।

আমরা এই অধ্যায়ে কমলকুমার মজুমদারের ‘অন্তর্জলী যাত্রা’ ও ‘গোলাপ সুন্দরী’ উপন্যাসের ‘কথনশৈলী’ নিয়ে আলোচনা করবার চেষ্টা করলাম। এই ‘কথনশৈলী’ নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে আমরা দেখতে পেলাম কমলকুমার সর্বজ্ঞ কথক হয়ে আলোচ্য দুটি উপন্যাসের নিরীক্ষণ করেছেন। আবার পেয়েছি ‘মুক্ত পরোক্ষ বাচন’ যেখানেও তিনি চরিত্রের মনের কথা বলে যাচ্ছেন। ফলে দেখা যাচ্ছে কমলকুমার উপন্যাসের নিয়ন্ত্রণ নিজের হাতেই রাখছেন। ‘কাহিনি বলার কৌশল’ অংশে আমরা দেখতে পেলাম তিনি কাহিনি বলার ‘বর্ণনা অংশ’ ও ‘সংলাপ অংশ’ দুটিকেই তাঁর গদ্যশৈলীর অন্তর্ভুক্ত করেছেন। এছাড়াও তিনি কথনের ক্ষেত্রে ‘স্মৃতিচারণার রীতি’ ব্যবহার করেছেন যা তাঁর গদ্যশৈলীতে ভিন্নমাত্রা যুক্ত করেছে। সবশেষে আমাদের আলোচনার বিষয় হয়ে উঠেছে ‘প্রায় ভাষার ব্যবহার’। এই ‘প্রায় ভাষার ব্যবহার’ করে কমলকুমার চরিত্রের মনস্তাত্ত্বিক দিকটি আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন।

তথ্যসূত্র

কমলকুমার মজুমদার, নভেম্বর, ২০১৫, উপন্যাস সমগ্র, কলকাতা, আনন্দ, পৃ. ১-১০৫।

তৃতীয় অধ্যায়

আন্বয়িক বিন্যাস

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে কমলকুমার মজুমদার একজন বিরলতম কথাশিল্পী। তিনি গতানুগতিকতার বাইরে গিয়ে কথাসাহিত্যের নির্মাণ করতে চেয়েছিলেন। শব্দের পর শব্দ সাজিয়ে তিনি উপন্যাসকে নিয়ে যেতে চান চিত্রকলা ও উচ্চাঙ্গ সংগীতের স্তরে। উপন্যাসের রস আস্বাদনে বিদ্যাবুদ্ধিকে তিনি গুরুত্ব দিতে চাননি। এক্ষেত্রে তিনি বোধ শক্তিকেই প্রাধান্য দিতে চেয়েছেন। তাঁর উপন্যাস মূলত অনুভবের বিষয়। এই অধ্যায়ে আমরা আমাদের আলোচ্য উপন্যাস 'অন্তর্জলী যাত্রা' ও 'গোলাপ সুন্দরী' এর সাহায্যে কমলকুমারের উপন্যাসের 'আন্বয়িক বিন্যাস' এর বিষয়টি অনুসন্ধানের চেষ্টা করব মূলত চারটি বিষয়কে কেন্দ্র করে, যথা – 'সমান্তরালতা', 'বিচ্যুতি', 'বিশেষ্যবাচক রীতি – ক্রিয়াবাচক রীতি', 'সংসক্তির ব্যবহার'।

সমান্তরালতা - কমলকুমারের গদ্য এক নতুন ও মেধাময় অনুশীলন। সমগঠনের বা প্রায় সমগঠনের যে কোনো আন্বয়িক উপাদান যদি বারবার ব্যবহার করা হয় তবে তাকে 'সমান্তরালতা' বলা হয়। আখ্যানের মধ্যে 'সমান্তরালতা' – র ব্যবহার একে আলাদা মাত্রা এনে দেয়, পাঠকের কাছে আকর্ষণীয় করে তোলে। 'সমান্তরালতা' যে কেবল একটি বাক্যের মধ্যে দেখা যায় তা নয়, বাক্যের সীমা ছাড়িয়ে সমগ্র অনুচ্ছেদের একই ধরনের আন্বয়িক উপাদানের আবর্তনের ফলে একটি বিশেষ ধরনের সংগীতময়তা গড়ে ওঠে।

এবার আমরা স্তম্ভের আকারে 'সমান্তরালতা' দেখে নেব। স্তম্ভের আকারে 'সমান্তরালতা' এর উল্লেখ আমরা পেয়েছি ড. উদয় কুমার চক্রবর্তী ও ড. নীলিমা চক্রবর্তী এর 'ভাষাবিজ্ঞান' বইতে । স্তম্ভের আকারে 'সমান্তরালতা' এর ক্ষেত্রে দুই ধরনের সম্পর্ক দেখা যায়। একটি

স্তম্ভর জন্য উল্লম্ব সম্পর্ক সূত্র অন্যদিকে পাশাপাশি অবস্থানের জন্য আন্বয়িক সম্পর্ক দেখা যায়। কমলকুমার মজুমদারের উপন্যাস থেকে এই ধরনের 'সমান্তরালতা'-র দৃষ্টান্ত আমাদের অনুসন্ধানের বিষয় হয়ে উঠেছে —

- কেননা বৈজু এখনও ছায়া, কেননা বৈজু এখনও ব্যতিক্রম, কেননা বৈজু এখনও স্বেচ্ছাচারিতার বেদনাদায়ক নাম। - অন্তর্জলী যাত্রা, পৃষ্ঠা সংখ্যা –১০

ক	খ	গ	ঘ
কেননা	বৈজু	এখনও	ছায়া
কেননা	বৈজু	এখনও	ব্যতিক্রম
কেননা	বৈজু	এখনও	স্বেচ্ছাচারিতার বেদনাদায়ক নাম

- তাহার এহেন সরল শেষ উক্তিতে পুরাতন মধুর পত্রের মায়া ছিল; সময় যেখানে শেফালি, সময় যেখানে অল্পবয়সী, সময় যেখানে হস্তীশাবকের ন্যায়...দর্শনের উপমা নহে—সত্যই পদ্মবনে জলকেলি করিতেছে। – অন্তর্জলী যাত্রা,পৃষ্ঠা সংখ্যা – ১১

ক	খ	গ
তাহার এহেন সরল শেষ উক্তিতে পুরাতন মধুর পত্রের মায়া ছিল	সময় যেখানে শেফালি	
	সময় যেখানে অল্পবয়সী	
	সময় যেখানে হস্তীশাবকের ন্যায়... দর্শনের উপমা নহে	সত্যই পদ্মবনে জলকেলি করিতেছে

- 'জ্ঞান এসেছে' উক্তিতে জলে নোঙ্গর নিক্ষেপ করার আওয়াজ ছিল, অনন্তহরি ইত্যাদির মধ্যে এক অপরিজ্ঞাত ভাবান্তর হয় — ক্রমাগতই কাহারা জপ করিতেছে, কাহারও মধ্যে শেষোক্ত চন্দ্রকলা পুনরায় দৃশ্যমান, কাহারও সম্মুখে জোনাকী খেলিতে লাহিল, কাহারও মধ্যে বর্ণচ্ছটা আলোড়িত হইল, কোথাও বিন্দু স্ফীত হইতে চাহিল ! — অন্তর্জলী যাত্রা, পৃষ্ঠা সংখ্যা – ২৩

ক	খ	গ	ঘ	ঙ
‘জ্ঞান এসেছে’ উক্তিতে জলে নোঙ্গর নিক্ষেপ করার আওয়াজ ছিল	অনন্তহরি ইত্যাদির মধ্যে এক অপরিজ্ঞাত ভাবান্তর হয়	ক্রমাগতই কাহারা জপ করিতেছে	কাহারও মধ্যে শেষোক্ত চন্দ্রকলা পুনরায় দৃশ্যমান	
			কাহারও সম্মুখে জোনাকী খেলিতে লাহিল	
			কাহারও মধ্যে বর্ণচ্ছটা আলোড়িত হইল	কোথাও বিন্দু স্ফীত হইতে চাহিল

- বার্দ্ধক্যের অশ্রু যশোবতীকে বহু জন্মের পুঞ্জীভূত সঙ্গ, বন্ধুত্ব, সৌহার্দ্দ্য, অন্তরঙ্গতা, মিত্রতা, মিত্রতার মধ্যে যেমন গঙ্গাজল,গঙ্গাজলের মধ্যে যেমন আপনি, আপনার মধ্যে যেমন অক্ষর, তাহা এক নিমেষেই দান করিল। - অন্তর্জলী যাত্রা,পৃষ্ঠা সংখ্যা – ৪৩

ক	খ	গ	ঘ
বার্দ্ধক্যের অশ্রু যশোবতীকে বহু জন্মের পুঞ্জীভূত	সঙ্গ		
	বন্ধুত্ব		
	সৌহার্দ্দ্য		
	অন্তরঙ্গতা		
	মিত্রতা		
		মিত্রতার মধ্যে যেমন গঙ্গাজল	
		গঙ্গাজলের মধ্যে যেমন আপনি	
		আপনার মধ্যে যেমন অক্ষর	
			তাহা এক নিমেষেই দান করিল

- এগুলি প্রতীক মাত্র কারণ ইহার ছায়া আতপ নাই, এগুলি প্রতীক মাত্র কারণ, ইহা গণিতের সংখ্যা আত্মিক নহে ; ইহাতে দৃষ্টির অভিজ্ঞতার স্বকীয়তা নাই, শুধুমাত্র খুসীর ব্যক্তিগত অনুভব আছে। - গোলাপসুন্দরী,পৃষ্ঠা সংখ্যা – ৮৩

ক	খ	গ	ঘ
এগুলি প্রতীক মাত্র কারণ	ইহার ছায়া আতপ নাই		
এগুলি প্রতীক মাত্র কারণ	ইহা গণিতের সংখ্যা আত্মিক নহে	ইহাতে দৃষ্টির অভিজ্ঞতার স্বকীয়তা নাই	শুধুমাত্র খুসীর ব্যক্তিগত অনুভব আছে

- তবে কেন পড়িয়া-থাকা-চাবি দর্শনে, দরজা দর্শনে, শিশু দর্শনে, তাহার দেহ শিহরিয়া ওঠে। — গোলাপ সুন্দরী, পৃষ্ঠা সংখ্যা – ৯৪

ক	খ	গ
তবে কেন পড়িয়া থাকা	চাবি দর্শনে	
	দরজা দর্শনে	
	শিশু দর্শনে	তাহার দেহ শিহরিয়া ওঠে

বিচ্যুতি — ড. উদয় কুমার চক্রবর্তী ও ড. নীলিমা চক্রবর্তী এর 'ভাষাবিজ্ঞান' বইতে আমরা 'বিচ্যুতিবাদ' এর তত্ত্বটি পায়। Ian Mukarovsky এই 'বিচ্যুতিবাদ' এর প্রবক্তা। ব্যাকরণের সূত্র অনুযায়ী আমাদের ব্যবহৃত ভাষা হল ভাষার আদর্শ গঠন। ভাষা যখন তার আদর্শ গঠন থেকে সরে যায় তখন তৈরি হয় বিচ্যুতি যা সাহিত্যের ভাষা। বিচ্যুতি-র প্রসঙ্গে 'প্রমুখন' (Foregrounding) আর 'গুরুত্বদান' (Focusing) এর কথা আমরা ঐ 'ভাষাবিজ্ঞান' বইতে পায়। গুরুত্বদানের মধ্যে দিয়ে বাচনের অন্তর্ভূক্ত কোনো শব্দকে বিশেষ ভাবে পাঠকের সামনে তুলে ধরা যাতে পাঠক লেখকের অভিপ্রায় উপলব্ধি করতে পারে। বিশেষ গুরুত্বযুক্ত এই শব্দ বা পদগুচ্ছ বাক্যের আন্বয়িক গঠনের ক্ষেত্রে একটি বৈচিত্র্য তৈরি করে। এই গুরুত্বদানের ফলে বাক্যের মাঝে আর শেষে অবস্থিত শব্দ বা পদগুচ্ছকে সামনের দিকে এগিয়ে আনা হয়। আর এই প্রক্রিয়াকেই বলে 'প্রমুখন' (Foregrounding)। আমাদের অনুসন্ধানের মাধ্যমে আলোচ্য উপন্যাস 'অন্তর্জলী যাত্রা' আর 'গোলাপ সুন্দরী' থেকে 'বিচ্যুতি' এর বিষয়টি দেখে নেবার চেষ্টা করা হল —

আদর্শরূপ	বিচ্যুতরূপ
১। তিনি বন্ধনের সকল কিছু সামগ্রীর উপর ভাঙ্গিয়া পড়িলেন।	১। বন্ধনের সকল কিছু সামগ্রীর উপর তিনি ভাঙ্গিয়া পড়িলেন। — অন্তর্জলী যাত্রা, পৃষ্ঠা সংখ্যা – ৩৮
২। তিনি এ কথাও নিশ্চিত বুঝিয়াছিলেন যে তাঁহার প্রশ্নের কোন অর্থ হয় না।	২। এ কথাও তিনি বুঝিয়াছিলেন নিশ্চিত যে তাঁহার প্রশ্নের কোন অর্থ হয় না। — অন্তর্জলী যাত্রা, পৃষ্ঠা সংখ্যা – ৩৯
৩। আপনার সম্পর্কে অনন্তর তাহার অসম্ভব সন্দেহ উপস্থিত হইল।	৩। অনন্তর আপনার সম্পর্কে তাহার অসম্ভব সন্দেহ উপস্থিত হইল। — অন্তর্জলী যাত্রা, পৃষ্ঠা সংখ্যা – ৪১
৪। যশোবতী অনেকক্ষণ পরে ধীর কণ্ঠে সলজ্জভাবে স্বামীর দেহের দিকে চাহিয়া প্রশ্ন করিলেন, "হ্যাঁ গো, আমার তরে তোমার মায়া হয়?"	৪। অনেকক্ষণ পরে যশোবতী ধীর কণ্ঠে সলজ্জভাবে স্বামীর দেহের দিকে চাহিয়া প্রশ্ন করিলেন, "হ্যাঁ গো, আমার তরে তোমার মায়া হয়?" — অন্তর্জলী যাত্রা, পৃষ্ঠা সংখ্যা - ৪৭
৫। চণ্ডাল অলঙ্কার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া মাটি ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।	৫। অলঙ্কার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া চণ্ডাল মাটি ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। — অন্তর্জলী যাত্রা, পৃষ্ঠা সংখ্যা – ৪৯
৬। তাঁহার চক্ষু মেলিয়া সহসা কি জানি কেন গাছ পাতা নদী জলকে বড় পরিচিত বোধ হয়।	৬। চক্ষু মেলিয়া সহসা কি জানি কেন গাছ পাতা নদী জলকে তাঁহার বড় পরিচিত বোধ হয়। — অন্তর্জলী যাত্রা, পৃষ্ঠা সংখ্যা – ৭১
৭। যশোবতী তাঁহার মুখ সঙ্গে সঙ্গে চাপিয়া ধরিলেন।	৭। সঙ্গে সঙ্গে যশোবতী তাঁহার মুখ চাপিয়া ধরিলেন। — অন্তর্জলী যাত্রা, পৃষ্ঠা সংখ্যা – ৭২
৮। বৃদ্ধ সীতারাম গুপ্তঘাতকের হস্তে আহত।	৮। গুপ্তঘাতকের হস্তে বৃদ্ধ সীতারাম আহত। — অন্তর্জলী যাত্রা, পৃষ্ঠা সংখ্যা – ৭৫
৯। যশোবতী এতর্দ্দশনে জলে নামিয়া পড়িলেন।	৯। এতর্দ্দশনে যশোবতী জলে নামিয়া পড়িলেন। — অন্তর্জলী যাত্রা, পৃষ্ঠা সংখ্যা – ৭৫
১০। বৃদ্ধকে একবার দেখিলেন।	১০। একবার বৃদ্ধকে দেখিলেন। — অন্তর্জলী যাত্রা, পৃষ্ঠা সংখ্যা - ৭৫
১১। বিলাস এই গাড়ীতেই যাইবে।	১১। এই গাড়ীতেই বিলাস যাইবে। — গোলাপ সুন্দরী, পৃষ্ঠা সংখ্যা – ৮৩
১২। মোহিতকে বঙ্গের গোলাপ বলিতে যে আহ্লাদ উদাত্ত হইয়া উঠে তাহা নিশ্চয়ই ধারণ করিয়াছিল।	১২। বঙ্গের গোলাপ বলিতে যে আহ্লাদ উদাত্ত হইয়া উঠে তাহা নিশ্চয়ই মোহিতকে ধারণ করিয়াছিল। — গোলাপ সুন্দরী, পৃষ্ঠা সংখ্যা – ৮৪
১৩। তাহার দৃষ্টিপথে এইসূত্রে রঙিন কাঁচের ছায়ায় চেট্টির মুখখানি ভাসিয়া উঠে!	১৩। এইসূত্রে রঙিন কাঁচের ছায়ায় চেট্টির মুখখানি তাহার দৃষ্টিপথে ভাসিয়া উঠে! — গোলাপ সুন্দরী, পৃষ্ঠা সংখ্যা - ৮৮
১৪। স্বামী ও স্ত্রী দুজনেই এ – হেন উক্তিতে ছোট করিয়া হাসিল।	১৪। এ – হেন উক্তিতে স্বামী ও স্ত্রী দুজনেই ছোট করিয়া হাসিল। — অন্তর্জলী যাত্রা, পৃষ্ঠা সংখ্যা – ৯০
১৫। আমার এবার মনে হচ্ছে যেন সমস্ত ছেলেবেলাটা গোলাপ হয়ে ফুটে উঠেছে।	১৫। মনে হচ্ছে যেন সমস্ত ছেলেবেলাটা আমার এবার গোলাপ হয়ে ফুটে উঠছে। — গোলাপ সুন্দরী, পৃষ্ঠা সংখ্যা – ৯৪

বিশেষ্যবাচক রীতি – ক্রিয়াবাচক রীতি — ড. উদয় কুমার চক্রবর্তী ও ড. নীলিমা চক্রবর্তী তাঁদের 'ভাষাবিজ্ঞান' বইতে বিশেষ্যবাচক রীতি ও ক্রিয়াবাচক রীতি এর কথা বলেছেন। বাংলা বাক্যে বিশেষ্যপদ ও ক্রিয়াপদ ব্যবহারের প্রবণতা বাক্যে ভিন্ন মাত্রা যুক্ত করে আর এর থেকেই তৈরি হয় বিশেষ্যবাচক রীতি এবং ক্রিয়াবাচক রীতি। এই বিশেষ্যবাচক রীতি এবং ক্রিয়াবাচক রীতি আখ্যানে বিশেষ ধরণের শৈলী তৈরি করে। আমাদের আলোচ্য উপন্যাসে ক্রিয়া বাচক রীতি ব্যবহারের বিষয়টি আমাদের অনুসন্ধানের বিষয় হয়ে উঠেছে, এই ধরনের কিছু উদাহরণ নিম্নে উল্লেখ করা হল —

- তথাপি উঠিয়া চারিটি খুঁটিতে চাঁদোয়া বাঁধিয়া আসিয়া বৃদ্ধের পাশেই বসিলেন। — অন্তর্জলী যাত্রা, পৃষ্ঠা সংখ্যা – ৩২

  বাক্য – ১ , ক্রিয়া – ৪ (উঠিয়া, বাঁধিয়া, আসিয়া, বসিলেন)

- যশোবতী কেশবিন্যাস কালে কিছু কিছু অনাবৃত হইয়া পড়িবার ভয়ে সকল দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। — অন্তর্জলী যাত্রা, পৃষ্ঠা সংখ্যা – ৪১

  বাক্য – ১ , ক্রিয়া – ২ (অনাবৃত হইয়া পড়িবার ভয়ে, দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়াছিলেন)

- যশোবতী ভীতা হইয়া তাঁহার হাতখানি অপসারণ করিতে গিয়া পুনরপি কণ্ঠ আবেষ্টন করিয়াছিলেন। — অন্তর্জলী যাত্রা, পৃষ্ঠা সংখ্যা – ৪৩

  বাক্য – ১ , ক্রিয়া – ৩ (ভীতা হইয়া, অপসারণ করতে গিয়া, আবেষ্টন করিয়াছিলেন)

- বৃদ্ধের মস্তক উত্তেজনায় অনেকখানি ছাড়িয়া উঠিয়া আবার যথাস্থানে ফিরিল। — অন্তর্জলী যাত্রা, পৃষ্ঠা সংখ্যা – ৪৬

  বাক্য – ১ , ক্রিয়া – ৩ (ছাড়িয়া, উঠিয়া, ফিরিল)

- ইহার পর অঙ্গুলি দিয়া আসব গ্রহণ করত চুষিতে লাগিল। — অন্তর্জলী যাত্রা, পৃষ্ঠা সংখ্যা – ৫০

  বাক্য – ১, ক্রিয়া – ২ (গ্রহণ করত, চুষিতে লাগিল)

- যন্ত্রচালিতের মত দু'এক পা অগ্রসর হইয়া যশোবতী অতর্কিতে দৌড়াইয়া গিয়া নিকটস্থ ভস্মপরিবৃত একখানি অর্দ্ধদগ্ধ কাষ্ঠ তুলিয়া লইয়া উন্মাদিনীর মত ছুটিয়া আসিয়া বৈজুনাথকে আঘাত করিলেন। — অন্তর্জলী যাত্রা, পৃষ্ঠা সংখ্যা – ৫৮

  বাক্য – ১ , ক্রিয়া – ৫ (অগ্রসর হইয়া, দৌড়াইয়া গিয়া, তুলিয়া লইয়া, ছুটিয়া আসিয়া, আঘাত করিলেন)

- যশোবতী কোনরূপে তাঁহার ঊর্দ্ধাঙ্গ আপনার ঊরুর উপরে স্থাপন করিয়া অঞ্চলপ্রান্ত দিয়া মুখ মুছাইতে মুছাইতে স্বরভঙ্গ কণ্ঠে নানা কথা বলিলেন। — অন্তর্জলী যাত্রা, পৃষ্ঠা সংখ্যা – ৫৯

  বাক্য – ১ , ক্রিয়া – ৩ (স্থাপন করিয়া, মুছাইতে মুছাইতে, নানা কথা বলিলেন)

- বিলাসকে যাইতে দেখিয়া মোহিত অসম্ভব চঞ্চল হইয়া উঠিল। — গোলাপ সুন্দরী, পরিস্থা সংখ্যা – ৮৫

  বাক্য – ১ , ক্রিয়া – ২ (যাইতে দেখিয়া, চঞ্চল হইয়া উঠিল)

- বিলাস খুব সোজা করিয়া একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিবার জন্য আপনার দেহটি হেলাইয়া দিয়াছিল। — গোলাপ সুন্দরী, পৃষ্ঠা সংখ্যা – ৮৯

  বাক্য – ১ , ক্রিয়া – ২ (সোজা করিয়া, হেলাইয়া দিয়াছিল)

- বিলাস গ্রাভেল ফেলা রাস্তায় সংযত পদক্ষেপ শুনিয়াই বাহিরে আসিয়া যথারীতি অভ্যর্থনা করে। —গোলাপ সুন্দরী, পৃষ্ঠা সংখ্যা – ৯১

  বাক্য – ১ , ক্রিয়া – ৩ (পদক্ষেপ শুনিয়া, বাহিরে আসিয়া, অভ্যর্থনা করে)

- সম্মুখের ওমির ফোটোর দিকে চাহিয়া অসহায় ভাবে আপনার মস্তক আন্দোলন করিল। — গোলাপ সুন্দরী, পৃষ্ঠা সংখ্যা – ৯৪

  বাক্য – ১ , ক্রিয়া – ২ (ফোটোর দিকে চাহিয়া, মস্তক আন্দোলন করিল)

- আবার মনে হইল হায় যদি একটি বক্র তুলির টান পাইতাম যাহার উপরে মাথা রাখিয়া কাল অতিবাহিত হইত। — গোলাপ সুন্দরী, পৃষ্ঠা সংখ্যা – ৯৫

  বাক্য – ১ , ক্রিয়া – ৪ (মনে হইল, টান পাইতাম, মাথা রাখিয়া, কাল অতিবাহিত হইত)

সংসক্তির ব্যবহার — ড. উদয় কুমার চক্রবর্তী ও ড. নীলিমা চক্রবর্তী তাঁদের 'ভাষাবিজ্ঞান' বইতে সাহিত্যের শৈলী এর ক্ষেত্রে 'সংসক্তির ব্যবহার' এর কথা বলেছেন। একটি বাচন তৈরি হয় একটি বক্তব্যের সঙ্গে আর একটি বক্তব্য যুক্ত হয়ে। ঐ বক্তব্য দুটিকে বলা হয় সংসক্ত উপাদান। কাহিনি বিন্যাসের ক্ষেত্রে এই সংসক্ত উপাদানের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। কমলকুমার মজুমদারের 'অন্তর্জলী যাত্রা' ও 'গোলাপ সুন্দরী' উপন্যাসের গদ্যশৈলীতে 'সংসক্তির ব্যবহার' এর বিষয়টি আমাদের অনুসন্ধানের ক্ষেত্র হয়ে উঠেছে। আলোচ্য উপন্যাস থেকে কিছু উদাহরণের মাধ্যমে অমিতাভ দাস তাঁর 'আখ্যানতত্ত্ব' বইতে যেভাবে ছকের সাহায্যে 'সংসক্তির ব্যবহার' উল্লেখ করেছেন সেই ভাবে এই বিষয়টি নিম্নে উল্লেখ করবার চেষ্টা করা হল —

➢ আলো ক্রমে আসিতেছে। এ নভোমণ্ডল মুক্তাফলের ছায়াবৎ হিম নীলাভ। আর অল্পকাল গত হইলে রক্তিমতা প্রভাব বিস্তার করিবে, পুনর্ব্বার আমরা, প্রাকৃতজনেরা, পুষ্পের উষ্ণতা চিহ্নিত হইব। ক্রমে আলো আসিতেছে।

অনতিদূরে উদার বিশাল প্রবাহিণী গঙ্গা, তরল মাতৃমূর্তি যথা, মধ্যে মধ্যে বায়ু অনর্গল উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে; এইস্থানে, বেলাতটে, বিবশকারী উদ্বিগ্নতা ক্ষুদ্র একটি জনমণ্ডলীকে আশ্রয় করিয়া আছে। কোথাও কারণের বিকার মাত্র নাই, প্রতিবিম্ব নাই, কোথাও স্বপ্ন পর্য্যন্ত নাই; এ কারণে যে, একটি মুহূর্ত্তের সকল কিছুকে বাস্তব করত স্মরণীয় করিয়া একের যে নাম ভিন্ন ক্রমাগতই অপ্রাকৃতিক পার্থিব, তাহারই প্রাণবায়ু নিষ্ক্রান্ত হইবে এবং তাই মানুষমাত্রই নিশ্চল, ম্রিয়মাণ, বিমূঢ়। ইহাদের প্রত্যেকেরই মুখে মুখে নির্ব্বোধ গাম্ভীর্য্য আরূঢ় হইয়া রহিয়াছে মনে হয়, কখন তাহারা কপালে করাঘাত করিবার অমোঘ সুযোগ পাইবে তাহারাই যেন বা কাল গণনা করিতেছে। কেননা চির অসূর্য্যম্পশ্যা জীবন এই প্রথম আলোকের শরণাপন্ন, কেননা শূন্যতা লবণাক্ত এবং মহাআকাশ অগ্নিময় হইবে।

আমাদের স্নেহের এ জগৎ নশ্বর, তথা চৈত্ররুক্ষ অগণন অন্ধকার সকলই, মৃন্ময় এবং অনিত্য; তথাপি ইহার, এই জগতের, স্থাবর ও জঙ্গমে পূর্ণিমা; ইহার চতুর্ব্বিংশতিতত্ত্বে, মানুষের দুঃখে, কোমল নিখাদ—সর্ব্বত্রে এরূপ কোন তন্মাত্রা নাই যেখানে যাহাতে—হাসি নাই, কারণ সর্ব্বভূতে, বহুতে, তিনি বিরাজমান।

হায়! ইদানীং সেই বহুর মধ্যে একটিকে পরিত্যাগ করত মহাব্যোমে, বিরাট শূন্যতায়, চক্ষুহীন জিহ্বাহীন স্তব্ধতায় তিনি অব্যক্ত হইবেন; চির রহস্যের, অনন্তের রূপ একই রহিবে। গঙ্গাতীরে অন্তর্জলী উদ্দেশ্যে আনীত সীতারাম চট্টোপাধ্যায় এই অগণিত বহুর মধ্যে—সেই নিঃসঙ্গ একটি। — অন্তর্জলী যাত্রা, পৃষ্ঠা সংখ্যা – ৫

পরপর বাক্য	সংসক্তি
১। আলো ক্রমে আসিতেছে।	আলো
২। এ নভোমণ্ডল মুক্তাফলের ছায়াবৎ হিম নীলাভ।	↓ নভোমণ্ডল
৩। আর অল্পকাল গত হইলে রক্তিমতা প্রভাব বিস্তার করিবে,	↓ রক্তিমতা
পুনর্ব্বার আমরা, প্রাকৃতজনেরা, পুষ্পের উষ্ণতা চিহ্নিত হইব।	আমরা
৪। ক্রমে আলো আসিতেছে।	প্রাকৃতজনেরা
	পুষ্পের উষ্ণতা
	আলো
৫। অনতিদূরে উদার বিশাল প্রবাহিণী গঙ্গা, তরল মাতৃমূর্তি যথা,	↓ প্রবাহিণী গঙ্গা
মধ্যে মধ্যে বায়ু অনর্গল উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে; এইস্থানে, বেলাতটে,	মাতৃমূর্তি
বিবশকারী উদ্বিগ্নতা ক্ষুদ্র একটি জনমণ্ডলীকে আশ্রয় করিয়া আছে।	বায়ু উচ্ছ্বসিত
	বেলাতটে
	উদ্বিগ্নতা জনমণ্ডলীকে
	আশ্রয় করেছে
৬। কোথাও কারণের বিকার মাত্র নাই, প্রতিবিম্ব নাই,	↓ বিকার নাই
কোথাও স্বপ্ন পর্য্যন্ত নাই; এ কারণে যে, একটি মুহূর্ত্তের	প্রতিবম্ব নাই
সকল কিছুকে বাস্তব করত স্মরণীয় করিয়া একের যে নাম ভিন্ন	স্বপ্ন নাই
ক্রমাগতই অপ্রাকৃতিক পার্থিব, তাহারই প্রাণবায়ু নিষ্ক্রান্ত হইবে	কারণ
এবং তাই মানুষমাত্রই নিশ্চল, ম্রিয়মাণ, বিমূঢ়।	অপ্রাকৃতিক পার্থিব
	প্রাণবায়ু
	নিশ্চল
	ম্রিয়মাণ

বিমূঢ়

৭। ইহাদের প্রত্যেকেরই মুখে মুখে নির্ব্বোধ গাম্ভীর্য্য আরূঢ় হইয়া রহিয়াছে মনে হয়, কখন তাহারা কপালে করাঘাত করিবার অমোঘ সুযোগ পাইবে তাহারাই যেন বা কাল গণনা করিতেছে।

গাম্ভীর্য্য → করাঘাত

৮। কেননা চির অসূর্য্যম্পশ্যা জীবন এই প্রথম আলোকের শরণাপন্ন, কেননা শূন্যতা লবণাক্ত এবং মহাআকাশ অগ্নিময় হইবে।

জীবন → লবণাক্ত অগ্নিময়

৯। আমাদের স্নেহের এ জগৎ নশ্বর, তথা চৈত্ররুক্ষ অগণন অন্ধকার সকলই, মৃন্ময় এবং অনিত্য; তথাপি ইহার, এই জগতের, স্থাবর ও জঙ্গমে পূর্ণিমা; ইহার চতুর্ব্বিংশতিতত্ত্বে, মানুষের দুঃখে, কোমল নিখাদ—সর্ব্বত্রে এরূপ কোন তন্মাত্রা নাই যেখানে যাহাতে—হাসি নাই, কারণ সর্ব্বভূতে, বহুতে, তিনি বিরাজমান।

নশ্বর → অন্ধকার → মৃন্ময় অনিত্য → সর্ব্বভূতে তাঁর অবস্থান

১০। হায়! ইদানীং সেই বহুর মধ্যে একটিকে পরিত্যাগ করত মহাব্যোমে, বিরাট শূন্যতায়, চক্ষুহীন জিহ্বাহীন স্তব্ধতায় তিনি অব্যক্ত হইবেন; চির রহস্যের, অনন্তের রূপ একই রহিবে।

বহুর মধ্যে → পরিত্যাগ → তাঁর অব্যক্ততায় → সব কিছুর এক থাকা

১১। গঙ্গাতীরে অন্তর্জলী উদ্দেশ্যে আনীত সীতারাম চট্টোপাধ্যায় এই অগণিত বহুর মধ্যে—সেই নিঃসঙ্গ একটি।

নিঃসঙ্গতা

এখানে এক থেকে চার সংখ্যক বাক্যের বিষয় আলো, ভোর হওয়ার কথা বলা হচ্ছে, প্রাকৃতজনদের পুনরায় জেগে ওঠার কথা বলা হয়েছে। পাঁচ থেকে সাত সংখ্যক বাক্যে উদ্বিগ্নতা জনমণ্ডলকে আশ্রয় করে আছে কারণ তারা নিজেদের সুযোগের জন্য কাল গণনা করছে। আট

থেকে দশ সংখ্যক বাক্যে জগৎ নশ্বর হলেও সব জায়গায় আনন্দ কারণ সব জায়গায় সবার মধ্যে তাঁর অর্থাৎ ঈশ্বরের অবস্থান। সমস্ত রহস্য, অনন্ত সব একই থাকলেও ঈশ্বর আজ সীতারামকে পরিত্যাগ করবে তাই সে আজ নিঃসঙ্গ। এইভাবে এক থেকে তিন সংখ্যক বাক্য, চার থেকে সাত সংখ্যক বাক্য, আট থেকে দশ সংখ্যক বাক্য প্রত্যেকের নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক সংসক্তি রয়েছে। আবার প্রত্যেক আবর্ত অর্থাৎ এক থেকে তিন, চার থেকে সাত, আট থেকে দশ এদের মধ্যেও সংসক্তি রয়েছে।

- বৈজুনাথ বিস্ময়ে অস্ফুট বচনে প্রশ্ন করিয়াছিল, ইহা কি সত্য ! এই সীতারাম, কীর্ত্তনের দল, কাশির আওয়াজ, বেলাতট এ সকল কিছুই কি স্বপ্ন ! দেহ – মায়াবন্ত বৈজুনাথ ভয়ে শঙ্কায় কেমন যেন হইয়া শিবার মত ধ্বনি করিয়া উঠিতে চাহিল ; তদনন্তর এক মূহুর্ত্তে ভেড়ীপথে না অতিবাহিত করিয়া সবেগে দৌড়াইয়া তখনও প্রজ্বলিত একটি চিতার নিকট আসিয়া, গ্রীষ্মকালীন দ্বিপ্রহরের কুকুরের মতই জিহ্বা প্রলম্বিত করত হাঁপাইতে লাগিল। — অন্তর্জলী যাত্রা,পৃষ্ঠা সংখ্যা – ১৮

পরপর বাক্য	সংসক্তি
১। বৈজুনাথ বিস্ময়ে অস্ফুট বচনে প্রশ্ন করিয়াছিল, ইহা কি সত্য !	সত্য ↓
২। এই সীতারাম, কীর্ত্তনের দল, কাশির আওয়াজ, বেলাতট এ সকল কিছুই কি স্বপ্ন !	↓
৩। দেহ – মায়াবন্ত বৈজুনাথ ভয়ে শঙ্কায় কেমন	ভয়
যেন হইয়া শিবার মত ধ্বনি করিয়া উঠিতে	সবেগে দৌড়ানো

চাহিল ; তদনন্তর এক মূহুর্ত্তে ভেড়ীপথে না হাঁপানো

অতিবাহিত করিয়া সবেগে দৌড়াইয়া তখনও

প্রজ্বলিত একটি চিতার নিকট আসিয়া, গ্রীষ্মকালীন

দ্বিপ্রহরের কুকুরের মতই জিহ্বা প্রলম্বিত করত হাঁপাইতে লাগিল।

প্রথম বাক্যের 'সত্য' আর দ্বিতীয় বাক্যের 'স্বপ্ন' সংসক্ত উপাদান। প্রথম ও দ্বিতীয় বাক্যের 'সত্য' ও 'স্বপ্ন' এর সঙ্গে তৃতীয় বাক্যের 'ভয়', 'সবেগে দৌড়ানো', ও 'হাঁপানো' সংসক্ত উপাদান। এই ভাবে সংসক্ত উপাদানের উপস্থিতি এখানে সংসক্তি তৈরি করেছে।

- বৃদ্ধের কর্ণে একটি হাস্যের শব্দ আসিল। তিনি কোথা হইতে হাস্যধ্বনি আসিতেছে তাহা অনুধাবন করিবার চেষ্টা করিয়া, বক্রদৃষ্টিতে দেখিলেন; দেখিলেন, যশোবতী এবং চণ্ডাল। সীতারাম অসম্ভব চঞ্চল হইয়া উঠিলেন, শিরা-উপশিরা স্ফীত হইল, অভ্যন্তরে কে যেন ধূম্রজালের সৃষ্টি করিল, আপনকার মাড়ি ঘর্ষণ করিলেন, ইহার শব্দ শয্যার খড়ে প্রতিধ্বনিত হইয়াছিল। যুগপৎ বিস্ময়ে ঈর্ষায় বার্দ্ধক্য যেন যৌবদশা প্রাপ্ত হইল। তিনি ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিলেন। ভাবিলেন, আমার আকাশই ভাল; কিন্তু সহস্র ধিক্কার তাঁহাকে মাটিতেই ধরিয়া রাখিল। চক্ষুর্দ্বয় কোনক্রমেই বন্ধ রাখিতে পারিলেন না। আক্ষেপে ক্ষোভে অভিমানে তিনি পুড়িতে লাগিলেন। একবার মাত্র কহিলেন —"তুমি না বামুনের বউ,ছিঃ" বলিয়া, ক্ষোভে দুঃখে অন্যদিকে মুখ করিয়া রহিলেন, তাঁহার শরীর তরঙ্গায়িত, সম্মুখে শ্মশান। — অন্তর্জলী যাত্রা, পৃষ্ঠা সংখ্যা – ৬৯

পরপর বাক্য	সংসক্তি
১। বৃদ্ধের কর্ণে একটি হাস্যের শব্দ আসিল।	হাসির শব্দ
২। তিনি কোথা হইতে হাস্যধ্বনি আসিতেছে	বক্রদৃষ্টিতে
তাহা অনুধাবন করিবার চেষ্টা করিয়া, বক্রদৃষ্টিতে	চঞ্চাল যশোবতীকে
দেখিলেন; দেখিলেন, যশোবতী এবং চঞ্চাল।	দেখা
৩। সীতারাম অসম্ভব চঞ্চল হইয়া উঠিলেন,	সীতারামের
শিরা-উপশিরা স্ফীত হইল, অভ্যন্তরে কে যেন	চঞ্চলতা
ধূম্রজালের সৃষ্টি করিল, আপনকার মাড়ি ঘর্ষণ	
করিলেন, ইহার শব্দ শয্যার খড়ে প্রতিধ্বনিত হইয়াছিল।	
৪। যুগপৎ বিস্ময়ে ঈর্ষায় বার্দ্ধক্য যেন যৌবদশা প্রাপ্ত হইল।	ঈর্ষা
৫। তিনি ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিলেন।	ক্ষিপ্ত
৬। ভাবিলেন, আমার আকাশই ভাল; কিন্তু	ধিক্কার
সহস্র ধিক্কার তাঁহাকে মাটিতেই ধরিয়া রাখিল।	
৭। চক্ষুর্দ্বয় কোনক্রমেই বন্ধ রাখিতে পারিলেন না।	বন্ধ
৮। আক্ষেপে ক্ষোভে অভিমানে তিনি পুড়িতে লাগিলেন।	পোড়া
৯। একবার মাত্র কহিলেন —"তুমি না বামুনের বউ,ছিঃ"	শরীর কেঁপে
বলিয়া, ক্ষোভে দুঃখে অন্যদিকে মুখ করিয়া রহিলেন,	উঠল

তাঁহার শরীর তরঙ্গায়িত, সম্মুখে শ্মশান।

এখানে প্রথম বাক্যের 'হাসির শব্দ' এর সঙ্গে দ্বিতীয় বাক্যের সীতারামের 'বক্রদৃষ্টিতে যশোবতী ও চণ্ডালকে দেখা' সংসক্ত উপদান। দ্বিতীয় বাক্যের এই দেখার সঙ্গে তৃতীয় বাক্যের 'সীতারামের চঞ্চলতা' সংসক্ত উপাদান। তৃতীয় বাক্যের চঞ্চলতা এর সঙ্গে চতুর্থ বাক্যের 'ঈর্ষা' সংসক্ত উপাদান। চতুর্থ বাক্যের 'ঈর্ষা' এর সঙ্গে পঞ্চম বাক্যের 'ক্ষিপ্ত হওয়া' সংসক্ত উপাদান। পঞ্চম বাক্যের 'ক্ষিপ্ত হওয়া' এর সঙ্গে ষষ্ঠ বাক্যের 'ধিক্কার' সংসক্ত উপাদান। ষষ্ঠ বাক্যের 'ধিক্কার' এর সঙ্গে সপ্তম বাক্যের 'চোখ বন্ধ করতে না পারা' সংসক্ত উপাদান। সপ্তম বাক্যের 'চোখ বন্ধ করতে না পারা' এর সঙ্গে অষ্টম বাক্যের 'অভিমানে পোড়া' সংসক্ত উপাদান। অষ্টম বাক্যের 'অভিমানে পোড়া' এর সঙ্গে নবম বাক্যের সীতারামের দেহ কেঁপে ওঠা' সংসক্ত উপাদান। প্রত্যেক বাক্যে সংসক্ত উপাদানের উপস্থিতি এখানে সংসক্তি তৈরি করেছে।

- হায় গোলাপের মত বিস্মৃত ফুল আর নাই সমস্ত মুহূর্ত্ত যাহার অনিত্যতা; প্রথমে শুকায় ধীরে ঝরিয়া চুপ, ক্ষণেকেই কোথাও ফুটিয়া উঠে, সমক্ষে থাকিয়াও চির-বিস্মৃত। — বিলাস এই রুগ্ন কথাটি, প্রত্যহই, বারবার উদ্ভিন্ন প্রস্ফুটিত গোলাপের প্রতি চাহিয়া ভাবিয়াছে; এ-সত্য তাহার নিজস্ব অভিজ্ঞতা। — গোলাপ সুন্দরী, পৃষ্ঠা সংখ্যা – ৯০

পরপর বাক্য	সংসক্তি
১। হায় গোলাপের মত বিস্মৃত ফুল	গোলাপ অনিত্য
আর নাই সমস্ত মুহূর্ত্ত যাহার অনিত্যতা;	
প্রথমে শুকায় ধীরে ঝরিয়া চুপ, ক্ষণেকেই	জন্মায় ঝরে যায়

কোথাও ফুটিয়া উঠে, সমক্ষে থাকিয়াও চির-বিস্মৃত। চির-বিস্মৃত

২। বিলাস এই রুগ্ন কথাটি, প্রত্যহই, বিলাসের নিজস্ব

বারবার উদ্ভিন্ন প্রস্ফুটিত গোলাপের প্রতি চাহিয়া অভিজ্ঞতা

ভাবিয়াছে; এ-সত্য তাহার নিজস্ব অভিজ্ঞতা।

প্রথম বাক্যের 'গোলাপের অনিত্যতা, জন্মানো ঝরে যাওয়া ও চির-বিস্মৃত হওয়া' দ্বিতীয় বাক্যের 'বিলাসের নিজস্ব অভিজ্ঞতা' এর সঙ্গে সংসক্ত উপাদান। ফলে সংসক্ত উপাদানের উপস্থিতির জন্য এখানে সংসক্তি তৈরি হয়াছে।

- বিলাস এখন আপনার ঘরে জানালা খুলিয়া দাঁড়াইয়াছিল। এমত সময়, প্রবল মেঘ – ঘর্ষণ শুনিল; সঙ্গে সঙ্গে দৃষ্টি ফিরাইয়া দেখিল যেটুকু আলো ছিল তাহাও নাই এবং কে যেন ত্রাসে ভয়ে এইমাত্র দ্রুতপদক্ষেপে যাওয়া – আসা করিতেছে। যে দরজাকে সে একদা ভয় করিয়াছে সেই দরজার দুই পাশ ধরিয়া দাঁড়াইল। বুঝিল মনিক এই অন্ধকারে ঘুরিয়া বিভ্রান্ত হইতেছেন, আর যে তিনি ভিত কণ্ঠে কহিলেন "আলো নিভে গেছে", অন্ধের মত হস্তদ্বারা সমস্ত বস্তু স্পর্শ করিতে করিতে চলিয়াছে, অনেক দূর, না অনেক সময়ের পারে সে গিয়াছে, ইতিমধ্যে একবার মনে হইল মনিকও দেশলাই খুঁজিতেছেন। এইভাবে খুঁজিতে খুঁজিতে যে হাতে বিলাসের একদা কাঁটা ফুটিয়াছিল, যে হাতে গ্রন্থ ধরিয়া শ্লোক পাঠ করে, সেই নিমিত্তমাত্র হাতে, উষ্ণতার স্পর্শ লাগিল মানবীর দেহ অথবা নিঃশ্বাস! বাষ্পসম্ভূত মেঘ, মেঘ উৎপন্ন আলোকে...ভাস্কর্য্যের বিপুলতা বিলাস দেখিল। এইটুকু দেখা লইয়া তাহার মনে হয় যে ঘুম ভাল। — গোলাপ সুন্দরী, পৃষ্ঠা সংখ্যা – ১০৪

পরপর বাক্য	সংসক্তি
১। বিলাস এখন আপনার ঘরে জানালা খুলিয়া দাঁড়াইয়াছিল।	ঘরে
২। এমত সময়, প্রবল মেঘ – ঘর্ষণ শুনিল; সঙ্গে সঙ্গে দৃষ্টি ফিরাইয়া দেখিল যেটুকু আলো ছিল তাহাও নাই এবং কে যেন ত্রাসে ভয়ে এইমাত্র দ্রুতপদক্ষেপে যাওয়া – আসা করিতেছে।	অন্ধকার ঘরে কেউ যাতায়াত করছে
৩। যে দরজাকে সে একদা ভয় করিয়াছে সেই দরজার দুই পাশ ধরিয়া দাঁড়াইল।	ভয়
৪। বুঝিল মনিক এই অন্ধকারে ঘুরিয়া বিভ্রান্ত হইতেছেন, আর যে তিনি ভিত কণ্ঠে কহিলেন "আলো নিভে গেছে", অন্ধের মত হস্তদ্বারা সমস্ত বস্তু স্পর্শ করিতে করিতে চলিয়াছে, অনেক দূর, না অনেক সময়ের পারে সে গিয়াছে, ইতিমধ্যে একবার মনে হইল মনিকও দেশলাই খুঁজিতেছেন।	মনিক অন্ধকারে দেশলাই খুঁজছে
৫। এইভাবে খুঁজিতে খুঁজিতে যে হাতে বিলাসের একদা কাঁটা ফুটিয়াছিল, যে হাতে গ্রন্থ ধরিয়া শ্লোক পাঠ করে, সেই নিমিত্তমাত্র হাতে, উষ্ণতার স্পর্শ লাগিল মানবীর দেহ অথবা নিঃশ্বাস!	বিলাসের হাতে কারও স্পর্শ লাগে
৬। বাষ্পসম্ভূত মেঘ, মেঘ উৎপন্ন আলোকে... ভাস্কর্য্যের বিপুলতা বিলাস দেখিল।	ভাস্কর্য্যের বিলাসিতা বিলাসের দেখা হল
৭। এইটুকু দেখা লইয়া তাহার মনে হয় যে ঘুম ভাল।	ঘুম

প্রথম বাক্যের ‘ঘরে’ দ্বিতীয় বাক্যের ‘অন্ধকার ঘরে কেউ যাতায়াত করছে’ এর সঙ্গে সংসক্ত উপাদান। দ্বিতীয় বাক্যের ‘অন্ধকার ঘরে কেউ যাতায়াত করছে’ এর সঙ্গে তৃতীয় বাক্যের ‘ভয়’ সংসক্ত উপাদান। তৃতীয় বাক্যের ‘ভয়’ এর সঙ্গে চতুর্থ বাক্যের ‘মনিক অন্ধকারে দেশলাই খুঁজছে’ সংসক্ত উওপাদান। চতুর্থ বাক্যের ‘মনিক অন্ধকারে দেশলাই খুঁজছে’ এর সঙ্গে পঞ্চম বাক্যের ‘বিলাসের হাতে কারও স্পর্শ লাগে’ সংসক্ত উওপাদান। পঞ্চম বাক্যের ‘বিলাসের হাতে কারও স্পর্শ লাগে’ এর সঙ্গে ষষ্ট বাক্যের ‘ভাস্কর্য্যের বিলাসিতা বিলাসের দেখা হল’ সংসক্ত উপাদান। ষষ্ট বাক্যের ‘ভাস্কর্য্যের বিলাসিতা বিলাসের দেখা হল’ এর সঙ্গে সপ্তম বাক্যের ‘ঘুম’ সংসক্ত উপাদান। সংসক্ত উপাদানের উপস্থিতিতে এখানে সংসক্তি তৈরি হয়েছে।

আলোচ্য ‘অন্তর্জলী যাত্রা’ ও ‘গোলাপ সুন্দরী’ উপন্যাসের মধ্যে দিয়ে কমলকুমার মজুমদারের গদ্যশৈলীর আন্বয়িক বিন্যাসের দিকটি আমরা অনুসন্ধান করবার চেষ্টা করলাম। এক্ষেত্রে আমরা যে বিষয়গুলি নির্বাচন করে আলোচনার চেষ্টা করেছি তার প্রথমেই হল ‘সমান্তরালতা’। এক্ষেত্রে আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি সেটা হল কমলকুমারের ব্যবহৃত ‘সমান্তরালতা’ এর বিন্যাস জটিল। এরপরেই আমাদের আলোচ্য বিষয় ছিল ‘বিচ্যুতি’। ‘বিচ্যুতি’ ব্যবহারের মধ্যে দিয়ে তিনি তাঁর গদ্যে কাব্যময়তা তৈরি করেছেন। পরবর্তীতে আমাদের আলোচনার বিষয় হয়ে উঠেছে ‘বিশেষ্যবাচক রীতি–ক্রিয়াবাচক রীতি’। এই বিষয়টি আলোচনা করতে গিয়ে যেটা আমরা দেখতে পেলাম তা হল কমলকুমার একটি বাক্যে একাধিক ক্রিয়ার সমাবেশ ঘটিয়েছেন। সাহিত্যের শৈলীর এটিও একটি দিক। এরপরেই আমাদের আলোচনার বিষয় হয়ে উঠেছে ‘সংসক্তির ব্যবহার’। ঘটনার পর ঘটনা জুড়ে গিয়ে তৈরি হয় আখ্যান। প্রত্যেক ঘটনার মধ্যে থাকে সামান্যতম সাদৃশ্য। কমলকুমার তাঁর আখ্যান গঠনে প্রত্যেক ঘটনার মধ্যে এই সামান্যতম সাদৃশ্য বজায় রেখেছেন। ফলে ‘সংসক্তির ব্যবহার’ তাঁর গদ্য শৈলীর অন্তর্ভুক্ত হয়ে উঠেছে।

তথ্যসূত্র:

কমলকুমার মজুমদার, নভেম্বর, ২০১৫, উপন্যাস সমগ্র, কলকাতা, আনন্দ, পৃ. ১-১০৫।

চতুর্থ অধ্যায়

চিত্রকল্প নির্মাণ ও কাব্যময় গদ্যভাষা

কমলকুমার মজুমদার ছিলেন একজন চিত্রশিল্পী। তাঁর পাঠকরা কমলকুমারের ছবি আঁকার সঙ্গে প্রথম থেকেই পরিচিত ছিল। কারণ তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত পত্রিকায়, গল্প – উপন্যাসের প্রচ্ছদ ও বই এর ভেতরের অলংকরণ তিনি নিজেই করতেন। চিত্রশিল্পী কমলকুমার তাঁর গদ্যশৈলীতেও চিত্রকল্পের নির্মাণ করেছেন যা আমাদের এই অধ্যায়ের অনুসন্ধানের বিষয় হয়ে উঠেছে। এর সঙ্গে আমরা এই অধ্যায়ে তাঁর লেখায় গদ্যভাষার কাব্যময়তাও কোথাও আছে কিনা তা দেখে নেবার চেষ্টা করব।

চিত্রকল্প নির্মাণ – সুমিতা চক্রবর্তী তাঁর 'মূর্তিতে কি দিবে ধরা' প্রবন্ধে শব্দ দিয়ে নির্মিত ছবিকে চিত্রকল্প বলেছেন। যা আমাদের কেবল দর্শন ইন্দ্রিয় নয় অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের মধ্যেও অনুভবের স্মৃতি জাগায় তাই চিত্রকল্প। চিত্রকল্প হল এমন যা আমাদের অনুভবকে স্পন্দিত করে আমাদের মধ্যের আবেগকে জাগিয়ে তোলে। চিত্রকল্পের উপলব্ধি আসলে একধরনের মানসপ্রক্রিয়া।

কমলকুমার মজুমদার তাঁর লেখায় চিত্রকল্প বা ইমেজ ব্যবহার করে তাঁর নির্মিত গদ্যশৈলীতে যুক্ত করেছেন আরও একটি মাত্রা। গদ্যে ব্যবহৃত চিত্র পাঠকের কল্পনাকে এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে যায়। ঔপন্যাসিকের করা বর্ণনা চিত্রকল্পের মাধ্যমে পাঠকের মানস লোকে উদ্ভাসিত হয়ে তাকে লেখাটির আরও কাছে নিয়ে যায়। চিত্রকল্পের মধ্যে দিয়ে পাঠক উপন্যাসের সঙ্গে নিজেকে মিশিয়ে দিতে পারে, একাত্ম করে দিতে পারে। আমাদের আলোচ্য উপন্যাস থেকে কমলকুমারের নির্মিত চিত্রকল্প আমাদের অনুসন্ধানের বিষয় হয়ে উঠেছে।

কমলকুমার মজুমদার ‘অন্তর্জলীযাত্রা’ ও ‘গোলাপসুন্দরী’ উপন্যাসে দুই ধরনের চিত্রকল্প ব্যবহার করেছেন, যথা – মানবিক চিত্রকল্প ও প্রাকৃতিক চিত্রকল্প। কিছু উদাহরণের সাহায্যে এই চিত্রকল্প গুলি দেখে নেবার চেষ্টা নিম্নে করা হল —

মানবিক চিত্রকল্প :

- সঙ্কীর্ণ পথ, একটি ডুলি দেখা গেল।

  সুন্দর লাল কল্কা ছাপ ‘আরকট’ ছিটের কাপড়ের মধ্যে অসম্ভব করুন স্তিমিত ক্রন্দনের শব্দের আধার এই ডুলিখানি, জালা যেখানে রাখা সেখানেই সন্তর্পণে রাখা হইল। — অন্তর্জলী যাত্রা, পৃষ্ঠা সংখ্যা – ২৭

  এই চিত্রকল্পের সাহায্যে কমলকুমার ‘অন্তর্জলী যাত্রা’ উপন্যাসে সীতারামের সাথে বিবাহ করতে আসা যশোবতীর মনের অবস্থার ছবি আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। এই ডুলিটিকে তিনি বলেছেন ‘অসম্ভব করুন স্তিমিত ক্রন্দনের শব্দের আধার’। এই চিত্রকল্প থেকে আমরা বুঝতে পারছি যে যশোবতী যৌবনে উত্তীর্ণ হয়েছে অথচ কূল রক্ষার জন্য মৃত্যু পথ যাত্রী সীতারামের সঙ্গে বিয়ে করতে বাধ্য হচ্ছে তার মনে যে অসম্ভব দুঃখ ও বেদনার অনুভূতির সৃষ্টি হচ্ছে তা।

- অনিন্দ্যসুন্দর একটি সালাঙ্কারা কন্যা প্রতীয়মান হইল, ক্রন্দনের ফলে অনেক স্থানের চন্দন মুছিয়াছে, আকর্ণবিস্তৃত লোচন রক্তাভ, হলুদ প্রলেপে মুখমন্ডল ঈষৎ স্বর্ণসবুজ। সর্ব্বলক্ষণে দেবীভাব বর্ত্তমান, ফলে সহজেই মনে হইবে এ যেন বা চম্পক ঈশ্বরী, লক্ষ্মী

প্রতিমা। শুধুমাত্র মুখখানি জন্ম দুঃখিনীর মতই বিষাদময়। — অন্তর্জলী যাত্রা, পৃষ্ঠা সংখ্যা – ২৭

এই চিত্রকল্পের সাহায্যে কমলকুমার 'অন্তর্জলী যাত্রা' উপন্যাসের অন্যতম প্রধান চরিত্র যশোবতীর মুখের সঙ্গে লক্ষ্মীপ্রতিমার মুখের সাদৃশ্য প্রকাশ করেছেন। যে মেয়ে জানে যে তার মৃত্যু আসন্ন তার মধ্যে বিয়ের যে কোন আনন্দ থাকতে পারেনা তা এই চিত্রকল্পে ফুটে উঠেছে। কারণ কেঁদে কেঁদে যশোবতী তার সমস্ত সাজ-সজ্জা নষ্ট করে ফেলেছে, তার চোখে কোন রকম আনন্দের রেশ নেই তাতে রক্তাক্ত ভবিষ্যতের লাল রঙ। এই যশোবতীর মধ্যে দিয়ে কমলকুমার সেই সময়ের সমস্ত জন্ম দুঃখিনী মেয়ের মনের যন্ত্রণার ছবি আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন।

- যশোবতী বৃদ্ধকে দেখিয়াই চক্ষু তুলিলেন, সীতারামের পিছনে, নিম্নে প্রবাহিণী গঙ্গা দেখিলেন, স্রোতে গলিত দেহে শকুন বসিয়া মনঃসংযোগ করিতে চেষ্টা করিতেছে, তাহারাই পার্শ্বে চক্রাকারে ঘুরিয়া কাক তাহাকে বিরক্ত করে। বেলাতটে একটি অকেজো ভাওলিয়া, যাহার গায়ে মেটে সিন্দূর দিয়া আঁকা চক্ষু, নিম্নে দিয়া ধ্বনিসহকারে জল বহিয়া যাইতেছে। ক্বচিৎ জলজ পানা। — অন্তর্জলী যাত্রা, পৃষ্ঠা সংখ্যা – ২৭

এই চিত্রকল্পের সাহায্যে কমলকুমার 'অন্তর্জলী যাত্রা' উপন্যাসে বৃদ্ধ সীতারামের অবস্থার ছবি আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। মৃত্যু তার আসন্ন তাই তো শকুন, কাক এর অপেক্ষার কথা পাচ্ছি। অন্যদিকে গঙ্গা নদীর প্রবহমানতা কোথাও যেন জীবনের প্রবহমানতার ইঙ্গিত দিচ্ছে। জলের প্রবাহের মধ্যের শব্দ যেন জীবনের কোলাহলের কথা বলছে। জলে স্রোত আছে, ফলে জলজ পানা মাঝে মাঝে ভেসে যাচ্ছে। এই ভেসে

যাওয়ার মধ্যে দিয়ে আমরা সীতারামের জীবনের সঙ্গে বিয়ের মধ্যে দিয়ে যশোবতীর জীবন জুড়ে গিয়ে তাঁর জীবন স্রোতে যশোবতীর ভেসে যাওয়া উপলব্ধি করতে পারছি। সতীদাহের মতো নির্মম নিয়মে যশোবতী কেন, সেই সময়ের অনেক মেয়েই এইভাবে জীবনের স্রোতে ভেসে গিয়েছিল।

- এই কথা কয়টি যশোবতীর যৌবন উচ্ছল শরীরখানিকে যেন বা নিঙড়াইয়া দিল, তাঁহার কণ্ঠ মধ্যে পাখীর বাসার স্বাদ ও গন্ধে রুদ্ধ, তাঁহার মুখখানি ডুলির পর্দ্দার আড়ালে চকিতে অদৃশ্য এবং পরক্ষণেই মুখমন্ডলের অর্দ্ধভাগ পরিদৃশ্যমান হইল। — অন্তর্জলী যাত্রা, পৃষ্ঠা সংখ্যা – ২৮

এই চিত্রকল্পটি বুঝতে গেলে আমাদের আগের কিছু কথা বলে নিতে হবে, কৃষ্ণপ্রাণ যখন লক্ষ্মীনারায়ণকে বলে যে সীতারামের বেশ জ্ঞান আছে, বিয়ের সময় উঠে বসবে, এছাড়াও জেনে নিতে বলে মেয়ে তার পছন্দ হয়েছে কিনা এইসব কথা। এইগুলি শুনে যশোবতীর অবস্থা বোঝাতে কমলকুমার এই চিত্রকল্পটি আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। কথা গুলি শুনে যশোবতীর মধ্যে যৌবনের যে শক্তি ছিল, যে চঞ্চলতা ছিল তা মুহূর্তের মধ্যে নিঃশেষ হয়ে গেল। নতুন জীবন গড়ার, বাসা বাঁধার যে স্বপ্ন সে দেখছিল তা যে সম্ভব নয় তা বুঝতে পেরে সে বাক্‌রুদ্ধ হয়ে পরল। বাস্তবের এই সত্যকে সে দেখতে চাইছে আবার এটা থেকে দূরে যেতেও চাইছে ফলে ডুলির ভেতর থেকে কখনও তাকে দেখা যাচ্ছে আবার কখনও সে নিজেকে আড়াল করে নিচ্ছে।

- অধুনা যশোবতী চতুর্দ্দোলায় , তিনি যেন লক্ষ্মীমূর্ত্তি, একহস্তে প্রস্ফুটিত পদ্ম, কখনও বা দেখিলেন পঞ্চ পল্লব, অন্য হাতে বরাভয়। - অন্তর্জলী যাত্রা, পৃষ্ঠা সংখ্যা – ৩৮

এই চিত্রকল্পের সাহায্যে কমলকুমার 'অন্তর্জলী যাত্রা' উপন্যাসে আমাদের দেখাচ্ছেন যশোবতী যখন নিজের সতীদাহ কল্পনা করছে সে সময়ের ছবি। যশোবতীকে কমলকুমার লক্ষ্মী প্রতিমার মতো করে পাঠকের সামনে তুলে ধরেছেন। সতীদাহের মধ্যে দিয়ে একটি মেয়ে যে দেবীত্বে উত্তীর্ণ হয় সেই সময় মেয়েদের যেভাবে বোঝানো হতো সেই ভাবনায় যশোবতীর কল্পনার মধ্যে দিয়ে তিনি আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন।

প্রাকৃতিক চিত্রকল্প :

- সীতারাম তখনও প্রবলবেগে কাশিতেছিলেন এমতবস্থায় মন্ত্রচালিত পাষাণ প্রতিমা যশোবতীর হস্তধৃত মাল্যখানি আসিয়া বৃদ্ধের কণ্ঠলগ্ন হইল।

এসময় বায়ু স্থির, গৃহাভিমুখী পক্ষীরা মুখরিত, স্রোত শান্ত এবং প্রকৃতি স্তব্ধ নিথর হইয়াছিল। — অন্তর্জলী যাত্রা, পৃষ্ঠা সংখ্যা – ২৯

এই চিত্রকল্পের সাহায্যে কমলকুমার 'অন্তর্জলী যাত্রা' উপন্যাসে অন্তর্জলীর জন্য আনা সীতারামের সঙ্গে যশোবতীর বিবাহের পর এই বিবাহ দেখে সমস্ত প্রকৃতির অবস্থা কেমন হয়েছিল সেই ছবি আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। অবশ্যম্ভাবী সতীদাহের উপলব্ধির ফলে যে বেদনা প্রকৃতিতে ছড়িয়ে পড়েছিল তাতে বাতাস স্থির হয়ে গিয়েছিল, যেসমস্ত পাখিরা নিশ্চিন্তে বাড়ি ফিরছিল তাদের মধ্যে কলরব দেখা যায়, পাশেই বয়ে চলা গঙ্গার স্রোত অর্থাৎ জীবনের স্রোত থেমে যায় এবং প্রকৃতির মধ্যে কোন প্রাণ থাকে না, প্রকৃতি নিথর হয়ে যায়।

- মনুষ্যদেহী চণ্ডালের ঈদৃশ দুঃসহ সঘন চীৎকারে দিকসকল আর এক চক্ষুতে পরিণত, ভ্রাতৃজীবনসকল ত্রাসযুক্ত; বৃক্ষ পত্রাদি থরহরি এবং সুখ-নীড় এ পৃথিবী এক মহাধ্বনিতে পরিপূর্ণ হইল, বিশ্বসংসার বুঝি যায় ! — অন্তর্জলী যাত্রা, পৃষ্ঠা সংখ্যা – ৫০

এই চিত্রকল্পের সাহায্যে কমলকুমার 'অন্তর্জলী যাত্রা' উপন্যাসে আমাদের দেখিয়েছেন শ্মশানের চাঁড়াল বৈজুনাথের রুদ্র মূর্তির ছবি। 'মনুষ্যদেহী চন্ডাল' অর্থাৎ তার দেহ মানুষের কিন্তু সে আসলে মানুষ নয় অন্যকিছু। সে যখন রেগে যায়, চিৎকার করে তখন সমস্ত দিক আরও একটি চোখ দিয়ে দেখে, সবাই খুব ভয় পায়, গাছের পাতা ভয়ে কাঁপতে থাকে, যে পৃথিবী সুখের নীড় তাও এক ধরনের মহাধ্বনিতে ভরে যায়। আসলে বৈজুনাথ যে সামান্য শ্মশানের চাঁড়াল নয়, সে যে প্রতিবাদী একজন মানুষ, সমাজের উচ্চবর্ণের মানুষ যে সতীদাহের প্রতিবাদ করতে পারেনা তা যে সে করতে পারে। সাধারণ মানুষ বৈজুনাথের এই ভেতরের সত্ত্বার সঙ্গে পরিচিত না হলেও প্রকৃতি তার এই সত্ত্বার সঙ্গে পরিচিত হয়ে উঠতে পেরেছিল। সেইজন্যই তার রাগে সমস্ত প্রকৃতি ভয়ে কাঁপতে থাকে, তার ভেতরের শক্তিকে প্রকৃতি উপলব্ধি করে।

- উগ্রতেজা বলিষ্ঠ বৈজুনাথ এখনও তেমনিভাবে তাঁহাদের বেষ্টন করিয়া সবেগে ধাববান, তাহার পদদলিত তপ্ত ও তীব্রতর প্রভাবিশিষ্ট ধূলারাশি শূন্যমার্গে উত্থিত; সে দাম্ভিক, তাহারা ঔদ্ধত্যের পরিসীমা নাই, তাহার বেগবিক্রমে একথাই প্রকাশিত যে, আমি মহাবিটপী সকল অক্লেশে উৎপাটন করিব, আমি উত্তুঙ্গ গিরিসকল বিদারণ করিব, আমি মত্ত সাগরকে সংক্ষোভিত করিব। — অন্তর্জলী যাত্রা, পৃষ্ঠা সংখ্যা – ৫১

এই চিত্রকল্পের মধ্যে দিয়ে কমলকুমার 'অন্তর্জলী যাত্রা' উপন্যাসে আবার শ্মশানের চাঁড়াল বৈজুনাথের ভেতরে লুকিয়ে থাকা সত্ত্বার সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিচ্ছেন। বৈজুনাথ উগ্রতেজা, বলিষ্ঠ। তার পায়ের তাপে ধূলা গরম হয়ে এক শক্তি লাভ করে যার ফলে তা থেকে একধরনের আলো বেরতে থাকে ও তা উপরে উঠে যায়। বৈজুনাথ দাম্ভিক, তার ভেতরের শক্তি এই কথায় প্রকাশ করে যে সে বড়ো গাছকে তুলে ফেলতে পারে, পাহাড় পর্বত ভেদ করতে পারে, যে সমুদ্রে অনেক ঢেউ তাকেও সে নিজের আয়ত্তে আনতে পারে। সাধারণ মানুষ বৈজুনাথের মধ্যে লুকিয়ে থাকা অসীম শক্তির সন্ধান আমরা পাচ্ছি এই চিত্রকল্পের মধ্যে দিয়ে।

- বিলাস অন্যত্র, কেননা সম্মুখেই, নিম্নের আকাশে, তরুণসূর্য্যবর্ণ কখনও অচিরাৎ নীল, বুদ্বুদসকল, যদৃচ্ছাবশতঃ ভাসিয়া বেড়াইতেছে। একটি আর একটি এইরূপে অনেক অনেক — আসন্ন সন্ধ্যায়, ক্রমে নক্ষত্র পরম্পরা যেমন দেখা যায় — দূর কোন হরিত ক্ষেত্রের হেমন্তের অপরাহ্ন মন্থনকারী রাখালের বাঁশরীর শুদ্ধনিখাদে দেহধারণ করত সুডৌল দ্যুতিসম্পন্ন বুদ্বুদগুলি ইদানীং উঠানামা করে, এগুলি সুন্দর, উজ্জ্বল, বাবু, অভিমানী আশ্চর্য্য ! — গোলাপ সুন্দরী, পৃষ্ঠা সংখ্যা – ৮৩

এই চিত্রকল্পের সাহায্যে কমলকুমার 'গোলাপ সুন্দরী' উপন্যাসে বুদ্বুদের যে প্রতীক ব্যবহার করেছেন তার ছবি আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। নীল আকাশে বুদ্বুদ, অনেকগুলি বুদ্বুদ ভেসে বেরাচ্ছে। সন্ধ্যা নামার সময় আকাশে যেমন নক্ষত্র দেখা যায়, সবুজ মাঠে হেমন্তের বিকেলে রাখালের বাঁশির শব্দ যেমন শোনা যায় তেমনি বুদ্বুদ গুলি ভেসে যাচ্ছে। এই বুদ্বুদ গুলোর মধ্যে সৌন্দর্য আছে, ঔজ্জ্বল্য আছে, বাবু এর ভাব আছে,

অভিমান আছে। এই বুদ্বুদের প্রতীকের মধ্যে দিয়ে কমলকুমার আসলে যক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত বিলাসের ছবি আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন।

কাব্যময় গদ্যভাষা – ড. উদয় কুমার চক্রবর্তী ও ড. নীলিমা চক্রবর্তী তাঁদের 'ভাষাবিজ্ঞান' বইতে 'কাব্যময় গদ্যভাষা' এর কথা বলেছেন। উপন্যাসের গদ্যভাষার চলনে মাঝে মাঝেই কাব্যময়তা লক্ষ্য করা যায়। গদ্য ভাষার একঘিয়েমি কাটিয়ে ওঠার জন্যই বোধ হয় ঔপন্যাসিক কাব্যময়তা ব্যবহার করেন। এই কাব্যময়তা গদ্যের চলনের গতি বাড়িয়ে দেয়। গদ্যভাষায় কাব্যময়তা সৃষ্টির ক্ষেত্রে বিচ্যুতি একটি বড় কৌশল।

কমলকুমার মজুমদার গদ্যভাষার নির্মাণে 'কাব্যময় গদ্যভাষা' ব্যবহার করেছেন। প্রত্যেক ঔপন্যাসিকেরই নিজস্ব ভাষা ব্যবহারে স্বতন্ত্রতা রয়েছে যা তাঁদের একে অপরের থেকে আলাদা করে দেয়। আমাদের আলোচ্য 'অন্তর্জলী যাত্রা' ও 'গোলাপ সুন্দরী' উপন্যাসের 'কাব্যময় গদ্যভাষা' আমাদের অনুসন্ধানের বিষয় হয়ে উঠেছে। বিষয়টি বুঝে নেবার জন্য আলোচ্য উপন্যাস থেকে কিছু উদাহরণ নিম্নে দেবার চেষ্টা করব ও ড. উদয় কুমার চক্রবর্তী ও ড. নীলিমা চক্রবর্তী তাঁদের 'ভাষাবিজ্ঞান' বইতে 'কাব্যময় গদ্যভাষা' এর বিষয়টি উল্লেখ করতে গিয়ে কিছু উদাহরণ কবিতার আকারে সাজিয়ে নিয়েছেন আলোচনার সুবিধার জন্য। আমরাও এখানে ঐ রীতি অবলম্বন করে প্রত্যেকটি উদাহরণকে বিশ্লেষণ করবার চেষ্টা করব —

- তাঁহার মানসচক্ষে ক্রমে উদ্ভাসিত হইয়াছিল নামহীন পক্ষীর বক্ষদেশের উপর দিয়া, আপন ঐশ্বর্যরাশি ও বিলাসসামগ্রী লইয়া, দ্বিপ্রহরের নীল লবণসমুদ্র পার হইয়া যাইতেছে ; দেখিয়াছিলেন, প্রকৃতি আপনার বিন্দুবৎ শরীর লইয়া স্বহস্তের ডমরু

বাজাইতে বাজাইতে স্থবির পুরুষকে কেন্দ্র করিয়া নৃত্যময় পদবিক্ষেপে ভ্রমণশীলা। — অন্তর্জলী যাত্রা,পৃষ্ঠা সংখ্যা – ২০

উপরিউক্ত অংশটিকে গদ্য কবিতার আকারে সাজিয়ে নেবার চেষ্টা করা হল —

তাঁহার মানসচক্ষে ক্রমে উদ্ভাসিত হইয়াছিল নামহীন পক্ষীর বক্ষদেশের উপর দিয়া, আপন ঐশ্বর্যরাশি ও বিলাসসামগ্রী লইয়া,

দ্বিপ্রহরের নীল লবণসমুদ্র পার হইয়া যাইতেছে;

দেখিয়াছিলেন,

প্রকৃতি আপনার বিন্দুবৎ শরীর লইয়া স্বহস্তের ডম্বরু বাজাইতে বাজাইতে স্থবির পুরুষকে কেন্দ্র করিয়া নৃত্যময় পদবিক্ষেপে ভ্রমণশিলা।

- দূরে, স্রোতক্ষুব্ধ বেলাতটে, একাকিনী যশোবতী, তিনি দন্ডায়মানা, হস্তপরি মুখমণ্ডল ঢাকিয়া ক্রন্দনরত, একপার্শ্বে কেশদাম হাওয়ায় সর্পিল, নিম্নে জলোচ্ছ্বাস। এখন তিনি উর্দ্ধে মুখ তুলিয়া হস্তদ্বয় আশায় উত্তোলন করত ডাকিলেন, “ভগবান ভগবান” বলিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। একদা, কাহাদের যেন বা সম্মুখের আকাশে দেখিলেন, দেখিলেন...আরব্য রজনী সমূহ এখানেই স্বপ্ন কুড়ায় আর কাহারা তাহাদের অনুনয় করে, “ আমাদের বিনিদ্র রজনীর বারমাস্যা নিয়ে যাও, নিয়ে যাও...” তিনি আরও দেখিলেন, গোলাপের কেশরাশ্রিত পরাগ, যাহা ভ্রমরের অঙ্গীভূত হয়, আঃ ভ্রমর ! তুমি বুদ্বুদের বাহন, দুঃখের বাহক। সে পরাগ শূন্যতার মোহিনী মায়াতে বিমোহিত হইয়া

অচিরাৎ ভ্রমর অঙ্গচ্যুত—খসিয়া পড়িয়া ইদানীং উঠানামা করে...এরূপ নানাবিধ দর্শনে তিনি ভীতা, আর্ত্ত । - অন্তর্জলী যাত্রা, পৃষ্ঠা সংখ্যা – ৬৩

উপরিউক্ত অংশটিকে গদ্য কবিতার আকারে সাজিয়ে নেবার চেষ্টা করা হল —

দূরে, স্রোতক্ষুব্ধ বেলাতটে, একাকিনী যশোবতী,

তিনি দন্ডায়মানা,

হস্তপরি মুখমণ্ডল ঢাকিয়া ক্রন্দনরত,

একপার্শ্বে কেশদাম হাওয়ায় সর্পিল,

নিম্নে জলোচ্ছ্বাস।

এখন তিনি উর্দ্ধে মুখ তুলিয়া হস্তদ্বয় আশায় উত্তোলন করত ডাকিলেন, "ভগবান ভগবান" বলিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন।

একদা, কাহাদের যেন বা সম্মুখের আকাশে দেখিলেন,

দেখিলেন...আরব্য রজনী সমূহ এখানেই স্বপ্ন কুড়ায় আর কাহারা তাহাদের অনুনয় করে, " আমাদের বিনিদ্র রজনীর বারমাস্যা নিয়ে যাও, নিয়ে যাও..."

তিনি আরও দেখিলেন,

গোলাপের কেশরাশ্রিত পরাগ, যাহা ভ্রমরের অঙ্গীভূত হয়, আঃ ভ্রমর !

তুমি বুদ্বুদের বাহন, দুঃখের বাহক।

সে পরাগ শূন্যতার মোহিনী মায়াতে বিমোহিত হইয়া অচিরাৎ ভ্রমর অঙ্গচ্যুত—

খসিয়া পড়িয়া ইদানীং উঠানামা করে...

এরূপ নানাবিধ দর্শনে তিনি ভীতা, আর্ত্ত ।

- বায়ু স্থির, পাখিরা উড়িয়া গেল, ধরিত্রীর বক্ষে কে যেন হাঁটু ডলিতেছে। ত্রিলোক এক হইয়াছে। ওজস্বিনী বিশাল তরল সমতল শ্মশান দাম্ভিকভাবে আসিতেছে, মহাব্যোমে স্ফুলিঙ্গ উদ্ধত। — অন্তর্জলী যাত্রা, পৃষ্ঠা সংখ্যা – ৭৫

  উপরিউক্ত অংশটিকে গদ্য কবিতার আকারে সাজিয়ে নেবার চেষ্টা করা হল —

  বায়ু স্থির, পাখিরা উড়িয়া গেল,

  ধরিত্রীর বক্ষে কে যেন হাঁটু ডলিতেছে।

  ত্রিলোক এক হইয়াছে।

  ওজস্বিনী বিশাল তরল সমতল শ্মশান দাম্ভিকভাবে আসিতেছে,

  মহাব্যোমে স্ফুলিঙ্গ উদ্ধত।

- বিলাসের রুগ্ন বরফচাপা রঙটা মোহিতের এহেন কথায় রক্তিম হইয়াছিল, শিশুসুলভ মুখখানি তুলিয়া সে সভয়ে সজল নেত্রে তাঁহার প্রতি চাহিয়া, পরে, ধীরে, আপনার চতুষ্পার্শ্ব উপলব্ধি করিল; এই করিডোরের সাদা একটানা দেওয়াল — মধ্যরাতে রমণীর চোখের পলকের মত — মধ্যে মধ্যে সোনার জড়োয়া ফ্রেমে প্রসিদ্ধ ডাক্তারদের ছবি; নিকটেই কোক ! সমস্ত দেওয়ালে আলোর তারতম্যে, কখন বা অতীব দীন, এখানে চাপাগলার শব্দ, কোথাও অভিমান, এমন কি করাঘাত কভু বা দীর্ঘশ্বাস! এ দীর্ঘশ্বাস সম্ভবত তাহার নিজের, বিলাসের। বোধ হয় বিলাস এই বাড়ী, তথা স্থান — অথবা তাহার ইহকালের কিছুটা — সমস্ত অতীত ভালবাসিয়াছে। — গোলাপ সুন্দরী, পৃষ্ঠা সংখ্যা – ৮৪

  উপরিউক্ত অংশটিকে গদ্য কবিতার আকারে সাজিয়ে নেবার চেষ্টা করা হল —

বিলাসের রুগ্ন বরফচাপা রঙটা মোহিতের এহেন কথায় রক্তিম হইয়াছিল,

শিশুসুলভ মুখখানি তুলিয়া সে সভয়ে সজল নেত্রে তাঁহার প্রতি চাহিয়া,

পরে, ধীরে, আপনার চতুষ্পার্শ্ব উপলব্ধি করিল;

এই করিডোরের সাদা একটানা দেওয়াল —

মধ্যরাতে রমণীর চোখের পলকের মত —

মধ্যে মধ্যে সোনার জড়োয়া ফ্রেমে প্রসিদ্ধ ডাক্তারদের ছবি; নিকটেই কোক !

সমস্ত দেওয়ালে আলোর তারতম্যে, কখন বা অতীব দীন,

এখানে চাপাগলার শব্দ, কোথাও অভিমান,

এমন কি করাঘাত কভু বা দীর্ঘশ্বাস!

এ দীর্ঘশ্বাস সম্ভবত তাহার নিজের, বিলাসের।

বোধ হয় বিলাস এই বাড়ী, তথা স্থান —

অথবা তাহার ইহকালের কিছুটা —

সমস্ত অতীত ভালবাসিয়াছে।

- বিলাস দেখিয়াছিল, হলের প্রায় মধ্যস্থলে চেট্টি — সে আপনার খাট ছাড়িয়া এখন এখানে — তাহাকে দেখিয়া মনে হয় যে ঘোর উত্তেজনাবশত তাহার প্রায় নির্ব্বাপিত শরীরের মধ্যে যেটুকু ঔদ্ধত্য ছিল, তাহাও কম্পমান, সে ঊর্দ্ধে দৃষ্টি রাখিয়া অতি পরিশ্রান্ত নৃত্যরত বাইজীর মত তাহার ঠোঁট অদ্ভূত ভঙ্গিমায় বিকৃত হইতেছে মাত্র, কিন্তু স্বর নাই ... এইবার চেট্টি, ভয়ঙ্কর ভাবে আহত যেমন, টলিতে টলিতে অন্য আর খাটের বাজু ধরিয়া একটি হাত সঞ্চালন করিয়া সহসা উদাত্ত কণ্ঠে কহিল “ইয়া নিদ্রা অহো ভ্রাম্যমাণ এপিটাপ” — গোলাপ সুন্দরী,পৃষ্ঠা সংখ্যা – ৮৬

উপরিউক্ত অংশটিকে গদ্য কবিতার আকারে সাজিয়ে নেবার চেষ্টা করা হল —

বিলাস দেখিয়াছিল, হলের প্রায় মধ্যস্থলে চেট্টি —

সে আপনার খাট ছাড়িয়া এখন এখানে —

তাহাকে দেখিয়া মনে হয় যে ঘোর উত্তেজনাবশত তাহার প্রায় নির্ব্বাপিত শরীরের মধ্যে যেটুকু ঔদ্ধত্য ছিল,

তাহাও কম্পমান,

সে ঊর্দ্ধে দৃষ্টি রাখিয়া অতি পরিশ্রান্ত নৃত্যরত বাইজীর মত তাহার ঠোঁট অদ্ভূত ভাবে ভঙ্গিমায় বিকৃত হইতেছে মাত্র,

কিন্তু স্বর নাই ..... এইবার চেট্টি,

ভয়ঙ্কর ভাবে আহত যেমন,

টলিতে টলিতে অন্য আর খাটের বাজু ধরিয়া একটি হাত সঞ্চালন করিয়া সহসা উদাত্ত কণ্ঠে কহিল “ইয়া চলন্ত নিদ্রা অহো ভ্রাম্যমাণ এপিটাপ”

উপরিউক্ত উদাহরণ গুলিতে কাব্যময়তা যেভাবে প্রকাশিত হয়েছে তা এবার আলোচনা করে দেখা যাক —

১। শব্দের পুনরুক্তি কাব্যময়তা প্রকাশ করেছে। যেমন – ১ নং উদাহরণ থেকে ‘বাজাইতে বাজাইতে’, ২ নং উদাহরণ থেকে ‘ভগবান ভগবান’, ‘নিয়ে যাও, নিয়ে যাও’, ৪ নং উদাহরণ থেকে ‘মধ্যে মধ্যে’, ৫ নং উদাহরণ থেকে ‘টলিতে টলিতে’ ।

২। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই বাক্যখন্ড ছোট ছোট, তবে ছোট ছোট বাক্যখন্ডের মধ্যেও বড়ো বড়ো বাক্যখন্ড রয়েছে যেগুলি জুড়ে জুড়ে দীর্ঘ বাক্য গঠন করেছে।

৩। ইয়া স্বননশীল জাতীয় ধ্বনি। সাধু ক্রিয়াপদ ব্যবহার করতে গিয়ে এই ধরণের স্বননশীল জাতীয় ধ্বনি অনেকবার ব্যবহৃত হয়ে সংগীতময়তা তৈরী করেছে।

৪। বাক্য সমাপ্তি সূচক বিরতি চিহ্নের পরিবর্তে কোন কোন জায়গায় '—' চিহ্ন ব্যবহার করে অসমাপ্ত বাক্যের গঠন তৈরী করা হয়েছে।

৫। বিচ্যুতির মধ্যে দিয়ে কাব্যময়তা তৈরীর চেষ্টা করা হয়েছে। যেমন –

২ নং উদাহরণ থেকে,

'এখন তিনি উর্দ্ধে মুখ তুলিয়া হস্তদ্বয় আশায় উত্তোলন করত ডাকিলেন' > তিনি এখন উর্দ্ধে মুখ তুলিয়া হস্তদ্বয় আশায় উত্তোলন করত ডাকিলেন

'এরূপ নানাবিধ দর্শনে তিনি ভীতা, আর্ত্ত' > তিনি এরূপ নানাবিধ দর্শনে ভীতা, আর্ত্ত

৪ নং উদাহরণ থেকে,

'সে আপনার খাট ছাড়িয়া এখন এখানে' > সে এখন এখানে আপনার খাট ছাড়িয়া।

এই অধ্যায়ের অনুসন্ধানের মধ্যে দিয়ে কমলকুমারের গদ্যশৈলীর দুটি দিক আমাদের সামনে প্রকাশিত হয়ে উঠেছে, তাহল তাঁর গদ্যের চিত্রধর্মীতা ও গদ্যময়তা। এই দুটি দিক তাঁর গদ্যশৈলীর অন্যতম দিক। আমরা প্রথম অধ্যায়ে কমলকুমার সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করতে গিয়ে দেখতে পায় তিনি ছিলেন একজন চিত্রশিল্পী ও সেই সঙ্গে আর্টের শিক্ষক। ফলে এই শিল্পীর দৃষ্টিভঙ্গি তাঁর সাহিত্য রচনার সঙ্গে মিশে গিয়ে তাতে অন্যমাত্রা নিয়ে এসেছে।

তথ্যসূত্র

কমলকুমার মজুমদার, নভেম্বর, ২০১৫, উপন্যাস সমগ্র, কলকাতা, আনন্দ, পৃ. ১-১০৫।

পঞ্চম অধ্যায়

তুলনার আলোকে বঙ্কিমচন্দ্র ও কমলকুমার

বিংশ শতাব্দীর কথাসাহিত্যিক কমলকুমার মজুমদার স্বতন্ত্র গদ্যশৈলী এর প্রাচীর তুলে বাঙালি পাঠক থেকে সমালোচক সকলকেই চমকে দিয়েছিলেন। তিনি এমন একজন কথাসাহিত্যিক যিনি 'লেখকদের লেখক' নামে পরিচিত। বাংলা ভাষার প্রচলিত নিয়ম-কানুন এর পরিবর্তন ঘটিয়ে তিনি নিজস্ব শৈলী তৈরি করেছিলেন। কমলকুমার ভাষার আরোপ না করে ভাষার নির্মাণ করেছিলেন। তাঁর লেখায় লেখকের নিয়ন্ত্রন খুব ভালো ভাবেই আমরা লক্ষ্য করতে পারি। ভাষার প্রকাশ বলতে যা বোঝায় কমলকুমারের গদ্য তা নয়, তার বিরোধী। ভাবনার প্রকাশ করায় ভাষার একমাত্র কাজ নয়, সৌন্দর্য সৃষ্টি করাও ভাষার কাজ। কমলকুমার এই দুই দিক দিয়েই ভাষার ব্যবহার, শব্দের প্রয়োগকে ভাবতে চেয়েছিলেন।

কমলকুমারের গদ্যশৈলীর মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্রের গদ্যশৈলীর ছাপ অনেকাংশে লক্ষ্য করা যায়। আমাদের এই অধ্যায়ের অনুসন্ধানের মাধ্যমে আমরা বুঝে নেবার চেষ্টা করব কমলকুমার ও বঙ্কিমচন্দ্রের গদ্যশৈলী এক না এর মধ্যেও ভিন্নতা রয়েছে। এই অনুসন্ধানের জন্য বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসটি নির্বাচন করেছি আমাদের আলোচনার সুবিধার জন্য। এক্ষেত্রে আমরা কমলকুমারের 'অন্তর্জলী যাত্রা' ও 'গোলাপ সুন্দরী' এর সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসের গদ্যশৈলীর তুলনামূলক আলোচনার মধ্যে দিয়ে তাঁদের গদ্যশৈলীর মিল-অমিল গুলি বুঝে নেবার চেষ্টা করব।

কমলকুমার ও বঙ্কিমচন্দ্রের গদ্যশৈলীর তুলনামূলক আলোচনার ক্ষেত্রে আমরা প্রথমে 'সমান্তরালতা' এর দিকটি দেখে নেব কারণ উভয়েই তাঁদের লেখার মধ্যে 'সমান্তরালতা' এর

বিষয়টি নিয়ে এসেছেন। উভয়ের নির্বাচিত উপন্যাসের আলোচনার মাধ্যমে আমরা এই বিষয়টি নিম্নে অনুসন্ধানের চেষ্টা করলাম —

- নগেন্দ্র দেখিতে দেখিতে গেলেন, নদীর জল অবিরাম চল্ চল্ চলিতেছে—ছুটিতেছে—বাতাসে নাচিতেছে—রৌদ্রে হাসিতেছে—আবর্তে ডাকিতেছে। জল অশ্রান্ত—অনন্ত—ক্রীড়াময়। — বিষবৃক্ষ, পৃষ্ঠা সংখ্যা – ২০৫

এই উদাহরণে 'দেখিতে দেখিতে' ও 'চল্ চল্' পুনরুক্ত উদাহরণ ব্যবহার করা হয়েছে। একই ধরনের ক্রিয়াপদ, যেমন – 'চলিতেছে', 'ছুটিতেছে', 'নাচিতেছে', 'হাসিতেছে', 'ডাকিতেছে' ব্যবহার করা হয়েছে। এছাড়াও 'অশ্রান্ত' ও 'অনন্ত' এর মধ্যেও মিল লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এক্ষেত্রে গঠনের পুনরাবৃত্তি নাহলেও একই ধরনের পুনরক্ত উপাদান আর ক্রিয়াপদ ব্যবহারের ফলে 'সমান্তরালতা' তৈরি হয়েছে।

এই একই ধরনের 'সমান্তরালতা' – র দৃষ্টান্ত কমলকুমারের লেখার মধ্যেও দেখতে পাওয়া যায় নিম্নে ঐ ধরনের একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া হল —

- এবম্বিধ পাঠ, মরণোন্মুখ সীতারাম ব্যতীত আর আর যাঁহার উপস্থিত তাহাঁদের মনে স্বতঃই নৈরাশ্যের সঞ্চার করিতেছিল। এই পরিবেশকে, গীতা ব্যাখ্যার গোঙানি ছাড়াও, এইক্ষণে অধিকতর ভয়ঙ্কর রহস্যময় করিয়াছিল নিকটবর্ত্তী চিতা নির্ব্বাপিত করার উদ্দ্যেশে জল নিক্ষেপের ফলে হস্ হস্ শব্দ, তৎসহ অনর্গল ধূমরাশি, যাহা বিচিত্র আকারে কুণ্ডলী সৃষ্টি করত এক এক সময়ে ইহাদের অতিক্রম করিয়া অন্তর্হিত হইতেছিল। এবং অস্বস্তিকর নরবসার গন্ধ এখানে উদ্দাম। উপস্থিত সকলে, প্রতীয়মান সমস্ত কিছুর মধ্যে ভয়ঙ্কর চিরসত্যটি দেখিতে পাইতেছিল। কীর্ত্তনীয়ারা, তাহারা হতাশার চোখ দিয়া একটি গীত গাহিতেছিল। উপস্থিত সকলে মন দিয়া অনেক গীত শুনিতেছিল। - অন্তর্জলী যাত্রা,পৃষ্ঠা সংখ্যা – ৬

উপরিউক্ত উদাহরণটিতে 'আর আর', 'হস্ হস্', 'এক এক' এই ধরণের পুনরুক্ত উপাদান ব্যবহার করা হয়েছে। একই ধরণের ক্রিয়াপদ যেমন – 'করিতেছিল', 'হইতেছিল', 'পাইতেছিল', 'গাহিতেছিল', 'শুনিতেছিল' ব্যবহার করা হয়েছে। এখানে গঠনের পুনরাবৃত্তি হয়নি তবুও একই ধরণের পুনরক্ত উপাদান আর ক্রিয়াপদের ব্যবহারের ফলে 'সমান্তরালতা' তৈরী হয়েছে।

উপরিউক্ত উদাহরণের সাহায্যে আমরা কমলকুমার ও বঙ্কিমের গদ্যশৈলীতে মিল খুঁজে পেলাম, কিন্তু কমলকুমার এই মিলের মধ্যেও নিজস্বতা দেখিয়েছেন, 'গোলাপ সুন্দরী' থেকে এই ধরনের একটি উদাহরণ নিম্নে উল্লেখ করা হল —

- বিলাস ও ওমি ডাক্তারের পিছন পিছন করিডোরে আসিতেই দেখিল, মোহিত সবেগে হাতছানি দিয়া তাদেরকে ডাকিতেছে। বিলাস কর্ত্তব্যপরায়ণ এবং ওমি কৌতূহলপরতন্ত্র, দুইজনে হল অভিমুখে অগ্রসর হইল। হলের দরজার অনতিদূরে মনোরম আঙুরলতার কেয়ারি করা সিল্কের খাড়া স্ক্রীনের পাশ দিয়া দেখে, প্রত্যেক বিছানায় শুয়ে-শুয়ে নিরাকার রোগীসকল উর্দ্ধে দৃষ্টি রাখিয়া আত্মঘাতী সর্ব্বনাশের আওয়াজ করিতেছে, সে আওয়াজে গিরিনদী ভূমিকার পূর্ব্বেকার স্তব্ধতা ছিল, যে স্তব্ধতায় দশাসই উৎকণ্ঠিত যৌবনার কেশরাশির আঁধার ছিল, যে আঁধার বাঁশরীর বিচিত্র অন্তরীক্ষ – তথাপি বিলাস আপনার সংযম হারায় নাই, স্পষ্ট করিয়া চাহিতে চেষ্টা করিল। - গোলাপ সুন্দরী, পৃষ্ঠা সংখ্যা – ৮৬

  উপরিউক্ত উদাহরণে 'পিছন পিছন', 'শুয়ে শুয়ে', এই ধরণের পুনরুক্ত উপাদান ব্যবহার করা হয়েছে। একই ধরনের ক্রিয়াপদ যেমন – 'দেখিল', 'হইল', 'করিল', 'ডাকিতেছে', 'করিতেছে', 'স্তব্ধতা ছিল', 'আঁধার ছিল' পাওয়া যাচ্ছে। এই এতোটা পর্যন্ত কমলকুমার বঙ্কিমের অনুসারী কিন্তু এর পরে তিনি নিজস্বতা আনছেন। ঐ

বাক্যের পরবর্তী অংশে ‘সমান্তরালতা’ পাচ্ছি ‘বিলাস কর্ত্তব্যপরায়ণ’ এবং ‘ওমি কৌতূহলপরতন্ত্র’ এই বাক্য গুলিতে এবং ‘যে স্তব্ধতায় দশাসই উৎকণ্ঠিত যৌবনার কেশরাশির আঁধার ছিল’, ‘যে আঁধার বাঁশরীর বিচিত্র অন্তরীক্ষ’ এই বাক্য দুটিতে। আন্বয়িক গঠনের পুনরাবৃত্তি ঘটিয়ে ‘সমান্তরালতা’ তৈরি করেছেন কমলকুমার মজুমদার খুব সচেতন ভাবেই। একই অংশের মধ্যে দুভাবে ‘সমান্তরালতা’ উনি এনেছেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের লেখায় আর যে ধরনের ‘সমান্তরালতা’ দেখা যায় তা হল—

- পৃথিবীতে যদি আমার কোন সুখ থাকে, তবে সে স্বামী; পৃথিবীতে যদি আমার কোন চিন্তা থাকে, তবে সে স্বামী; পৃথিবীতে যদি আমার কোন কিছু সম্পত্তি থাকে, তবে সে স্বামী; সেই স্বামী, কুন্দনন্দিনী আমার হৃদয় হইতে কাড়িয়া লইতেছে। পৃথিবীতে আমার যদি কোন অভিলাষ থাকে, তবে সে স্বামীর স্নেহ। সেই স্বামীর স্নেহে কুন্দনন্দিনী আমাকে বঞ্চিত করিতেছে। — বিষবৃক্ষ, পৃষ্ঠা সংখ্যা – ২২১

একই ধরনের আন্বয়িক গঠন ব্যবহার করে এখানে ‘সমান্তরালতা’ তৈরি করেছেন বঙ্কিমচন্দ্র।

এই একই ধরনের ‘সমান্তরালতা’ এর দৃষ্টান্ত আমরা কমলকুমারের লেখাতেও দেখতে পায় —

- বন্ধু নাই, কবি নাই, পথ প্রদর্শক নাই। - গোলাপ সুন্দরী, পৃষ্ঠা সংখ্যা – ৯৪
- সেখানে বাতিদানে আলো নাই, আঁধার নাই। - গোলাপ সুন্দরী,পৃষ্ঠা সংখ্যা – ১০৩

একই ধরনের আন্বয়িক গঠনের মধ্যে দিয়ে কমলকুমার এখানে ‘সমান্তরালতা’ তৈরি করে তিনি এক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্রের অনুসারী হয়েছেন।

'সমান্তরালতা' এর মধ্যে কমলকুমার বৈচিত্র্য আনছেন। আর এই বৈচিত্র্য তৈরি করতে গিয়ে তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের থেকে নিজেকে পৃথক করেছেন। এইধরনের কিছু উদাহরণ নিম্নে দেখে নেবার চেষ্টা করা হল —

- বস্তুত ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের ব্রণবিরহিত সৌন্দর্য্যে রাত্র কিম্বা দিনের কোন প্রভাব নাই, আশ্চর্য্য অথচ ভ্রমরের বিচিত্র ভাব সিদ্ধির অন্যতম কল্পনা বিদ্যমান; উহা অজর — শুভ্রতায় যাহার জন্ম, পদ্মে যাহার জৈব ধর্মের সর্ব্বার্থসাধক বিহারভূমি, মৃত্যু যাহার নাই, সমাধিতে যাহার অস্তিত্ব। — অন্তর্জলী যাত্রা, পৃষ্ঠা সংখ্যা – ১৬
- এ দৃশ্যে বিলাস অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইল, যেখানে তাহার পার্শ্বস্থিত গোলাপ ফুটিয়াছে; যেখানে গতরাত্রে ঊর্দ্ধ আকাশকে দেহ এলাইতে দেখিয়াছে যেখানে.....অনেক ভ্রমর গুঞ্জন করিয়াছে — তাহা অবশেষে শবযাত্রার একটি সহজ পথ হইল! — গোলাপ সুন্দরী, পৃষ্ঠা সংখ্যা – ৯৭

উপরিউক্ত উদাহরণ দুটির 'উহা অজর — শুভ্রতায় যাহার জন্ম, পদ্মে যাহার জৈব ধর্মের সর্ব্বার্থসাধক বিহারভূমি, মৃত্যু যাহার নাই, সমাধিতে যাহার অস্তিত্ব' এই অংশে এবং 'যেখানে তাহার পার্শ্বস্থিত গোলাপ ফুটিয়াছে; যেখানে গতরাত্রে ঊর্দ্ধ আকাশকে দেহ এলাইতে দেখিয়াছে যেখানে.....অনেক ভ্রমর গুঞ্জন করিয়াছে — তাহা অবশেষে শবযাত্রার একটি সহজ পথ হইল' এই অংশে জটিল বাক্যবিন্যাস কৌশল ব্যবহার করে কমলকুমার 'সমান্তরালতা' তৈরি করে নিজস্বতা দেখিয়েছেন।

বঙ্কিমচন্দ্র ও কমলকুমারের বাক্যবিন্যাস কৌশলে মিল-অমিল এইবার আমাদের অনুসন্ধানের বিষয়। আমরা যদি উভয়ের উপন্যাস খুব মনোযোগ দিয়ে পড়ি তবে আমরা বুঝতে পারব উভয়ের বাক্যবিন্যাস কৌশলে মিলের তুলনায় অমিল বেশি।

বিষয়টি আমরা আমাদের আলোচ্য উপন্যাসের বিশ্লেষণের মধ্যে দিয়ে বুঝে নেবার চেষ্টা করব।

প্রথমেই দেখে নেবার চেষ্টা করে নেব উভয়ের মধ্যে কোথাও কোনো মিল পাওয়া যাচ্ছে কিনা, এই ধরনের কিছু উদাহরণ উভয়ের উপন্যাস থেকে দেখে নেবার চেষ্টা নিম্নে করা হল —

- হীরা দাসীর চাকরী গেল, কিন্তু দত্তবাড়ীর সঙ্গে সম্বন্ধ ঘুচিল না। — বিষবৃক্ষ, পৃষ্ঠা সংখ্যা – ২৪৩
- মালতী হীরাকে কিছু বলিল না, কিন্তু মনে মনে ভাবিতে লাগিল — মানুষটা কে ? — বিষবৃক্ষ, পৃষ্ঠা সংখ্যা – ২৪৩
- লক্ষ্মীনারায়ণ আপনার লোকেদের কাছে কর্জ্জ চাহিলেন, কিন্তু তাহাদের সকলের কাছেই কিছু কড়ি ছিল, রৌপ্যমুদ্রা ছিল না। — অন্তর্জলী যাত্রা, পৃষ্ঠা সংখ্যা – ২৯
- চেট্টির নামে অনেকেই ডাক্তারকে বলিয়াছে কিন্তু কোন ফল হয় নাই। — গোলাপ সুন্দরী, পৃষ্ঠা সংখ্যা – ৮৮

উপরিউক্ত বাক্য গুলিতে বঙ্কিমচন্দ্র ও কমলকুমার উভয়ের মধ্যে আমরা মিল পাচ্ছি, উভয়েই 'নিষেধমূলক কিন্তু' ব্যবহার করে সংযোগধর্মী বাক্যের গঠন তৈরি করেছেন।

- প্রাতে উঠিয়া হীরা কাজে গেল। — বিষবৃক্ষ, পৃষ্ঠা সংখ্যা – ২৩৮

এখানে দুটি বাক্য রয়েছে —

১। হীরা প্রাতে উঠিল।

২। হীরা কাজে গেল।

সমাপিকা ক্রিয়া উঠিল > অসমাপিকা ক্রিয়া উঠিয়া – তে পরিবর্তিত হয়েছে।

সমবিশেষ্যগুচ্ছ 'হীরা' বিলোপিত হয়েছে।

এখানে আশ্রয়ধর্মী বাক্য সংযোজন হয়েছে।

- কুন্দনন্দিনী বকুলান্তরাল হইতে উদ্যানমধ্যে দৃষ্টিপাত করিয়া নগেন্দ্রের দীর্ঘায়ত দেবমূর্তি দেখিতে পাইল না। — বিষবৃক্ষ, পৃষ্ঠা সংখ্যা – ২৪৫

এখানে দুটি বাক্য রয়েছে —

১। কুন্দনন্দিনী বকুলান্তরাল হইতে উদ্যানমধ্যে দৃষ্টিপাত করিল।

২। কুন্দনন্দিনী নগেন্দ্রের দীর্ঘায়ত দেবমূর্তি দেখিতে পাইল না।

সমাপিকা ক্রিয়া করিল > অসমাপিকা ক্রিয়া করিয়া – তে পরিবর্তিত হয়েছে।

সমবিশেষ্যগুচ্ছ 'কুন্দনন্দিনী' বিলোপিত হয়েছে।

এখানে আশ্রয়ধর্মী বাক্য সংযোজন হয়েছে।

- কন্যাকে ধরিয়া লক্ষ্মীনারায়ণ মাদুরের উপর বসাইয়া দিলেন। — অন্তর্জলী যাত্রা, পৃষ্ঠা সংখ্যা – ২৮

এখানে দুটি বাক্য রয়েছে —

১। লক্ষ্মীনারায়ণ কন্যাকে ধরিল।

২। লক্ষ্মীনারায়ণ মাদুরের উপর বসাইয়া দিলেন।

সমাপিকা ক্রিয়া ধরিল > অসমাপিকা ক্রিয়া ধরিয়া – তে পরিবর্তিত হয়েছে।

সমবিশেষ্যগুচ্ছ ‘লক্ষ্মীনারায়ণ’ বিলোপিত হয়েছে।

এখানে আশ্রয়ধর্মী বাক্য সংযোজন হয়েছে।

- বিলাস এখন আপনার ঘরে জানালা খুলিয়া দাঁড়াইয়াছিল। — গোলাপ সুন্দরী, পৃষ্ঠা সংখ্যা – ১০৩

এখানে দুটি বাক্য রয়েছে —

১। বিলাস এখন আপনার ঘরে জানালা খুলিল।

২। বিলাস দাঁড়াইয়াছিল।

সমাপিকা ক্রিয়া খুলিল > অসমাপিকা ক্রিয়া খুলিয়া – তে পরিবর্তিত হয়েছে।

সমবিশেষ্যগুচ্ছ ‘বিলাস’ বিলোপিত হয়েছে।

এখানে আশ্রয়ধর্মী বাক্য সংযোজন হয়েছে।

উপরিউক্ত বাক্য গুলিতে বঙ্কিমচন্দ্র ও কমলকুমার উভয়ের মধ্যে আমরা মিল পাচ্ছি, উভয়েই ‘আশ্রয়ধর্মী বাক্য সংযোজন’ ব্যবহার করেছেন।

এক্ষেত্রে উল্লেখ করতে চায় বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর লেখায় উপরিউক্ত দুই ধরনের বাক্য বার বার ব্যবহার করলেও কমলকুমার ছোট ছোট বাক্যের গঠন তাঁর লেখায় কম এনেছেন তিনি বেশি বড়ো বড়ো বাক্য তাঁর লেখার মধ্যে আনছেন। আমরা এবার দেখে নেবার চেষ্টা করব কমলকুমার কীভাবে বড়ো বড়ো বাক্যের গঠন ব্যবহার করে বঙ্কিমচন্দ্রের থেকে নিজেকে পৃথক করেছেন।

- বৈজু অল্প আয়াসেই অনাদৃত দেহভঙ্গিমায় ইতোমধ্যের কবিপ্রসিদ্ধ সেই মোহকে চূর্ণ করিয়া না দিয়া সহজ কণ্ঠে কহিল, কেননা সে রঞ্জিত স্তব্ধতার সহিত অমোঘ শূন্যতার,

শূন্যতা বোধের পার্থক্য, পার্থক্যের মধ্যে যে যুক্তিপূর্ণ স্বাভাবিকতা তাহা সে অবলীলাক্রমেই বুঝিত। - অন্তর্জলী যাত্রা, পৃষ্ঠা সংখ্যা – ১১

বাক্যের প্রথম অংশে ঢুকে আছে অনেক গুলি বাক্য

১। বৈজু অল্প আয়াসেই সহজ কণ্ঠে কহিল।

২। বৈজু অনাদৃত দেহভঙ্গিমায় সহজ কণ্ঠে কহিল।

৩। বৈজু ইতোমধ্যের কবিপ্রসিদ্ধ সেই মোহকে চূর্ণ করিয়া না দিয়া সহজ কণ্ঠে কহিল।

৩ নং বাক্যটিতে আশ্রয়ধর্মী বাক্য সংযোজন হয়েছে। বাক্যটির দুটি অংশ – প্রথম অংশ 'বৈজু ইতোমধ্যের কবিপ্রসিদ্ধ সেই মোহকে চূর্ণ করে দিল না', দ্বিতীয় অংশ 'বৈজু সহজ কণ্ঠে কহিল'। এখানে সমাপিকা ক্রিয়া করে দিল না > অসমাপিকা ক্রিয়া করিয়া না দিয়া হয়েছে।

৪। এরপরের তিনটি বাক্য পরস্পর সম্পর্কযুক্ত বাক্যের জটিল গঠনের মধ্যে পরছে। কিন্তু কমলকুমার তিনটি বাক্যের মধ্যে তৃতীয় বাক্যের গঠনে একটু বৈচিত্র্য আনছেন। তৃতীয় বাক্যটিকে আমরা ভেঙ্গে নেব প্রথমে। এখানেও দুটি বাক্য আছে, প্রথম, 'সে অবলীলাক্রমে বুঝিত' আর দ্বিতীয় বাক্য 'যে যুক্তিপূর্ণ স্বাভাবিকতা পার্থক্যের মধ্যে ছিল'। এখানে বাক্য বিগর্ভণ হচ্ছে, বাক্য দুটিকে সাজালে হবে,' ' সে যে যুক্তিপূর্ণ স্বাভাবিকতা পার্থক্যের মধ্যে ছিল তাহা অবলীলাক্রমে বুঝিত'। কিন্তু কমলকুমার এখানে বৈচিত্র্য এনে 'ছিল' ক্রিয়া বিলোপিত করেছেন ও 'সে' এর বিচ্যুতি ঘটিয়েছেন।

- "থাক থাক চুপ কর বেটা" লক্ষ্মীনারায়ণ বলিলেন, কেন না তিনি আশায় উত্তেজনায় অসহিষ্ণু হইয়াছিলেন, অবাধ্য অনন্তহরির অঙ্কের ফলাফলের প্রতি তাঁহার মন ছিল না। — অন্তর্জলী যাত্রা, পৃষ্ঠা সংখ্যা -১৩

বাক্যের প্রথম অংশে সংলাপের পর বর্ণনা লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

বাক্যটির দ্বিতীয় অংশে 'আলংকারিক না' 'কেন না' এর ব্যবহার লক্ষ্য করা যাচ্ছে, এই অংশেই আমরা দেখতে পাচ্ছি 'কেন না' বিচ্যুতির ফলে জায়গা পরিবর্তন করেছে।

বাক্যটির তৃতীয় অংশেও 'তাঁহার' বিচ্যুতির ফলে জায়গা পরিবর্তন করেছে।

ঐ দুটি অংশের আদর্শ গঠনটি হবে, 'তিনি আশায় উত্তেজনায় কেন না অসহিষ্ণু হইয়াছিলেন', 'তাঁহার অবাধ্য অনন্তহরির অঙ্কের ফলাফলের প্রতি মন ছিল না' ।

- দুঃসাহসী বৈজুনাথ অধিকন্তু অনুধাবন করে যে রৌদ্রকর্ম্মা অমোঘ বীভৎসতা এ সকল প্রতীকের পশ্চাতে ঘূর্ণায়মান, এবং ক্রমান্বয়ে আঘাত হানিতেছে। — অন্তর্জলী যাত্রা, পৃষ্ঠা সংখ্যা – ১৪

বাক্যটির প্রথম অংশে 'একক আশ্রয়মূলক অনুসর্গ যে' এর উপস্থিতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

বাক্যটি দ্বিতীয় অংশে 'যোজনামূলক এবং' এর উপস্থিতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এটি একটি সংযোগধর্মী বাক্যের গঠন।

- বৃদ্ধের দৈহিক জ্ঞান বিষয়ে অনন্তহরি অত্যধিক আস্থাবান; লক্ষ্মীনারায়ণ অনবরত দুর্গা নামে ব্যস্ত, তৎসহ তাঁহার করজোড় কভু বক্ষস্থলে ক্বচিৎ কপালের আজ্ঞাচক্রে আবেগে উত্তেজনায় উঠানামা করিতে লাগিল। — অন্তর্জলী যাত্রা, পৃষ্ঠা সংখ্যা – ২৩

  বাক্যের প্রথম অংশে বিচ্যুতি ঘটে 'অনন্তহরি' এর জায়গা পরিবর্তন হয়েছে এবং ঐ অংশের ক্রিয়া 'ছিল' বিলোপিত হয়েছে।

  বাক্যের দ্বিতীয় অংশেও ক্রিয়া 'ছিল' অনুপস্থিত।

বাক্যের তৃতীয় অংশে ‘তৎসহ’ বিচ্যুতির ফলে বাক্যের শুরুতে চলে এসেছে, আদর্শ বাক্যের গঠনটি হবে, ‘তাঁহার করজোড় কভু বক্ষস্থলে ক্বচিৎ কপালের আজ্ঞাচক্রে আবেগে উত্তেজনায় তৎসহ উঠানামা করিতে লাগিল’।

- সে জানালায় দাঁড়াইয়া ঘোর মেঘলিপ্ত আকাশের প্রতি লক্ষ্য করে, জানালার গরাদে তাহার হস্তদ্বয় এবং সেখানেই আপনার মুখমণ্ডল স্পর্শ করত লৌহের শৈত হইতে ঈষৎ আরাম পায়, আজিকার সারাদিনটা তাহার এক ভাবে কাটিয়াছে, যেখানে সে কারণ মাত্র; যে অহঙ্কার যে মনোভাব লইয়া ওমিকে সে চিঠি লিখিতে পারে তাহার এক কণা মাত্র অদ্য মাথাও তুলিতে পারে নাই, পিণ্ডদানের কথা মনে এতাবৎ আসে নাই, শ্লোক পাঠ কালে একদা সে ঊর্দ্ধের আকাশকে, নিঃসঙ্গতাকে শায়িত স্ত্রীলোকের মধ্যে দেখিয়াছে—সে কথা আরও স্পষ্ট করিয়া মনে হইতেছিল। — গোলাপ সুন্দরী, পৃষ্ঠা সংখ্যা – ১০০

  বাক্যটির প্রথম অংশে দুটি বাক্য রয়েছে,

  ১। সে জানালায় দাঁড়িয়ে।

  ২। সে ঘোর মেঘলিপ্ত আকাশের প্রতি লক্ষ্য করে।

  এখানে সমাপিকা ক্রিয়া দাঁড়িয়ে > অসমাপিকা ক্রিয়া দাঁড়াইয়া – তে পরিবর্তিত হয়েছে।

  সমবিশেষ্যগুচ্ছ ‘সে’ বিলোপিত হয়েছে। এখানে আশ্রয়ধর্মী বাক্যের গঠন তৈরি হয়েছে।

  বাক্যটির দ্বিতীয় অংশ ‘যোজনমূলক এবং’ এর সাহায্যে যুক্ত করে সংযোগধর্মী বাক্যের গঠন তৈরি করা হয়েছে। তবে এই অংশে বিচ্যুতিও লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এই অংশের আদর্শ গঠনটি হবে – ‘তাহার হস্তদ্বয় জানালার গরাদে এবং আপনার মুখমণ্ডল সেখানেই স্পর্শ করত লৌহের শৈত হইতে ঈষৎ আরাম পায়’।

বাক্যটির তৃতীয় অংশেও বিচ্যুতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে। 'তাহার' বিচ্যুতির ফলে জায়গা পরিবর্তন করেছে। এই অংশের আদর্শ গঠনটি হবে – 'তাহার আজিকার সারাদিনটা এক ভাবে কাটিয়াছে'।

বাক্যটির চতুর্থ অংশেও বিচ্যুতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে। 'সে' বিচ্যুতির ফলে জায়গা পরিবর্তন করেছে। এই অংশের আদর্শ গঠনটি হবে – 'সে যেখানে কারণ মাত্র'।

বাক্যটির পঞ্চম অংশ বেশ গুরুত্বপূর্ণ, এখানে একই সঙ্গে 'যে-সে' প্রতিনির্দেশক ব্যবহার করে আশ্রিত বাক্যখণ্ডের গঠন তৈরি করা হয়েছে আবার সেই সঙ্গে সমাপিকা ক্রিয়াকে অসমাপিকা ক্রিয়াতে পরিবর্তিত করে ঐ আশ্রিত বাক্যখণ্ডকে বাক্যের পরবর্তী অংশের সঙ্গে যুক্ত করে আশ্রয়ধর্মী বাক্যের গঠন তৈরি করা হয়েছে। এই বিষয়টি নিম্নে বিশ্লেষণ করে দেখাবার চেষ্টা করা হল —

১। যে অহঙ্কার যে মনোভাব লইয়া ওমিকে সে চিঠি লিখিতে পেরে ছিল।

এখানে 'যে-সে' প্রতিনির্দেশক যুক্ত হয়ে আশ্রিত বাক্যখণ্ড গঠিত হয়েছে।

সমাপিকা ক্রিয়া পেরে ছিল > অসমাপিকা ক্রিয়া পারে – তে পরিবর্তিত হয়ে বাক্যের পরবর্তী অংশের সঙ্গে যুক্ত হয়ে আশ্রয়ধর্মী বাক্যের গঠন তৈরি করেছে।

২। তাহার এক কণা মাত্র অদ্য মাথাও তুলিতে পারে নাই ।

বাক্যটির ষষ্ঠ অংশে 'এতাবৎ' বিচ্যুতির ফলে জায়গা পরিবর্তন করেছে, এই অংশের আদর্শ গঠন হবে – 'এতাবৎ পিণ্ডদানের কথা মনে আসে নাই'।

বাক্যটির সপ্তম অংশেও 'সে' বিচ্যুতির ফলে জায়গা পরিবর্তন করেছে, এই অংশের আদর্শ গঠনটি হবে –'সে শ্লোক পাঠ কালে একদা ঊর্দ্ধের আকাশকে, নিঃসঙ্গতাকে শায়িত স্ত্রীলোকের মধ্যে দেখিয়াছে'।

বাক্যটির অষ্টম অংশে ‘ও’ সংযোজন হয়েছে, ‘আরও’ বলার ফলে কোনো কিছু নির্দিষ্ট করে মনে পরার কথা বোঝা যাচ্ছে।

আমরা আলোচনার মধ্যে দিয়ে দেখতে পেলাম কমলকুমার কীভাবে একই বাক্যের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের বাক্যের বৈশিষ্ট্য নিয়ে এসে তাঁর বাক্যে বৈচিত্র্য আনছেন। বাক্যবিন্যাস কৌশলের এই বৈচিত্র্য বঙ্কিমচন্দ্রের লেখায় অনুপস্থিত।

কমলকুমারের নির্বাচিত দুটি উপন্যাসের সাহায্যে আমরা তাঁর গদ্যশৈলীকে আংশিক ভাবে জানার চেষ্টা করলাম। আমার গবেষণার এই ক্ষেত্রটি খুবই সীমিত তাই এক্ষেত্রে বিস্তৃত আলোচনা করা সম্ভব নাহলেও আমি আমার ক্ষেত্র অনুযায়ী যথাসম্ভব আলোচনা করবার চেষ্টা করেছি, আগামী দিনে আমার এই ক্ষুদ্র গবেষণা যদি সামান্য কাজেও ব্যবহৃত হয় তবে আমি আরও ভালো কাজ করার জন্য উৎসাহ পাব। আশা রাখছি ভবিষ্যতের গবেষকরা এই বিষয়টি তাঁদের গবেষণার সাহায্যে আরও সমৃদ্ধ করবে এবং গবেষণার নতুন নতুন দিশা নির্মাণ করবেন।

তথ্যসূত্র

কমলকুমার মজুমদার, নভেম্বর, ২০১৫, উপন্যাস সমগ্র, কলকাতা, আনন্দ, পৃ. ১-১০৫।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শ্রাবণ, ১৪১০, বঙ্কিম রচনাবলী, প্রথম খণ্ড : সমগ্র উপন্যাস, কলকাতা, সাহিত্য সংসদ, পৃ. ২০৫-২৮৪

গ্রন্থপঞ্জি

আকর গ্রন্থ

- কমলকুমার মজুমদার, নভেম্বর, ২০১৫, উপন্যাস সমগ্র, কলকাতা, আনন্দ
- বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শ্রাবণ, ১৪১০, বঙ্কিম রচনাবলী, প্রথম খণ্ড : সমগ্র উপন্যাস, কলকাতা, সাহিত্য সংসদ

সহায়ক গ্রন্থ

- অমিতাভ দাস, নভেম্বের, ২০১০, আখ্যানতত্ত্ব, কলকাতা, ইন্দাস
- অরুণকুমার বসু (সম্পা), ১৩৮৮, বাংলা গদ্য জিজ্ঞাসা, কলকাতা, সমতট প্রকাশনী
- উদয়কুমার চক্রবর্তী, মার্চ, ২০১৩, বাংলা সংবর্তনী ব্যাকরণ, কলকাতা, অরবিন্দ পাবলিকেশন
- উদয়কুমার চক্রবর্তী, নভেম্বের, ২০০৪, বাংলা পদগুচ্ছের সংগঠন, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং
- ড. উদয়কুমার চক্রবর্তী, ড. নীলিমা চক্রবর্তী, জানুয়ারি, ২০১৬, ভাষাবিজ্ঞান, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং
- দয়াময়ী মজুমদার, ২০১২, আমার স্বামী কমলকুমার, নদীয়া, আদম
- প্রশান্ত মাজী, ২০১৩, কমলকুমার, কলকাতা, পারুল
- বীরেন্দ্রনাথ রক্ষিত, ডিসেম্বের, ১৯৮৫, কাব্যবীজ ও কমলকুমার মজুমদার, কলকাতা, নবার্ক
- রাঘব বন্দ্যোপাধ্যায়, ডিসেম্বর, ২০১৫, কমলকুমার,কলকাতা পিছুটানের ইতিহাস, কলকাতা, আনন্দ

- শুভ মুখোপাধ্যায় (সম্পা), অগাস্ট, ২০১৩, কমলকুমার সৃষ্টি বৈচিত্রের খোঁজে, কলকাতা, প্রকাশ ভবন।
- সুব্রত রুদ্র (সম্পা), ১৯৮২, কমলকুমার রচনা ও স্মৃতি, কলকাতা, নাথ ব্রাদার্স

সহায়ক পত্র – পত্রিকা

- অর্ঘ্যকুসুম দত্তগুপ্ত (সম্পা), সমতট, দশম বর্ষপূর্তি সংখ্যা, জুলাই-সেপ্টেম্বর ১৯৭৯
- অমিত দাস, অনিরুদ্ধ ভৌমিক (সম্পা) উত্তরাধিকার, কমলকুমার মজুমদার সংখ্যা, ষষ্ঠ বর্ষ : চতুর্থ – সপ্তম বর্ষ : প্রথম সংখ্যা, জুলাই-ডিসেম্বর ১৯৯৭
- মানসকুমার চিনি (সম্পা) অন্যমন, কমলকুমার মজুমদার সংখ্যা, পরিসমাপ্তি সংখ্যা, ১ অক্টোবর ২০১৭
- মুন্সী মহম্মদ সাইফুল আহমেদ (সম্পা), উড়ালকথা, কমলকুমার মজুমদার বিশেষ সংখ্যা, দশমবর্ষ, অষ্টম-নবম সংখ্যা, জানুরারি ২০১৭
- রবিন ঘোষ (সম্পা), বিজ্ঞানপর্ব, ৪৩ তম বর্ষ, বার্ষিক সংখ্যা, ২০১৫